তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য-প্রাপ্তিস্বীকার। *

১৮৪৭ শক।

(১৮৪৫ ও ৪৬ শকের মূল্যপ্রাপ্তি ১৮৪৭ শকের শ্রাবণ-সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।)

বকেয়া।

শ্রীযুক্ত হরিপদ ত্রিবেদী	(১৮৪২-৪৫ শক)	৮৲
ডাক্তার শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ চৌধুরী	(১৮৪১-৪৩ শক)	৯৲
শ্রীযুক্ত কনকচন্দ্র বড়াল	(১৮৪৬ শক)	২৲
„ অবিনাশচন্দ্র দাস গুপ্ত	(১৮৪৬ শক)	২৲
„ সুশীলকুমার গুপ্ত	(১৮৪৫ শক)	২৲
„ „	(১৮৪৬ শক)	।/০
মিস্ এস্ ঘোষ	(১৮৪৫-৪৬ শক)	৬৲
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ	(১৮৪২-৪৩ শক)	৩৲
„ „	(১৮৪৪-৪৫ শক)	৬৲
„ বেহারীলাল মল্লিক	(১৮৪৬ শক)	৩৲
„ পান্নালাল দে	(১৮৪৬ শক)	৫৲
„ নিত্যানন্দ চন্দ্র	(১৮৪৬ শক)	৬৲
„ মধুসূদন জানা	(১৮৪০-৪১ শক)	৪৲
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	(১৮৪২-৪৪ শক)	৯৲
„ ভগবানচন্দ্র দাস	(১৮৪০-৪৩ শক)	৮৲
রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায়	(১৮৪২-৪৬ শক)	১৫৲
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস	(১৮৪৩-৪৪ শক)	৪৲
„ „	(১৮৪৫ শক)	৪৶০
„ বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	(১৮৪৬ শক)	২৲
„ বরদাপ্রসন্ন রায়	(১৮৪৬ শক)	২৲
„ চারুচন্দ্র বসু	(১৮৪৬ শক)	৩৲
„ অবিনাশচন্দ্র পাল	(১৮৪৬ শক)	২৲
„ অক্ষয়কুমার সিংহ	(১৮৪৫-৪৬ শক)	৪৲
পি. এম্ দত্ত স্কোয়ার	(১৮৪৬ শক)	৩৲
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মল্লিক	(১৮৪৬ শক)	২৲
শ্রীমতী প্রেমলতা দেবী	(১৮৪৬ শক)	২৲
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস	(১৮৪৫-৪৬ শক)	৬৲
„ উমাচরণ মিত্র	(১৮৪৬ শক)	১॥০
„ অক্ষয়কুমার দত্ত	(১৮৪৬ শক)	৩৲
„ শরৎচন্দ্র ঘোষ	(১৮৪২-৪৫ শক)	১২৲
„ রমেশচন্দ্র দত্ত	(১৮৪৩-৪৫ শক)	৯৲
এস্ কে, লাহিড়ী এস্কোয়ার	(১৮৪৫ শক)	৬৲
শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রনাথ মিত্র	(১৮৪৪-৪৫ শক)	৩৲
„ গয়ারাম পাল	(১৮৩৭-৪৫ শক)	১৮৲
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকৃষ্ণ বাগচী	(১৮৪৫ শক)	২৲
পি, এন, ভট্টাচার্য্য	(১৮৪৬ শক)	২৲
		১৫৮॥/০

* মাশুলের প্রাপ্তিস্বীকার করা হইল না।

৭

হাল।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বসন্তকৃষ্ণ বসু	(১৮৪৭ শক)	২৲
„ শিশিরকুমার দত্ত	„	১॥০
„ কৃষ্ণদাস দে	„	২৲
„ ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	„	৩৲
„ রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	„	২৲
„ মদনমোহন সেন	„	৩৲
„ হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়	„	৩৲
মিসেস্ এস হালদার	„	২৲
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	„	৩৲
শ্রীমতী রমলা বসু	„	২৲
„ স্বর্ণলতা রায়	„	২৲
Rev. G. Schanzlin	„	৩৲
শ্রীমতী লাবণ্যলতা গুহ	„	২৲
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার	(১৮৪৭ শক)	৩৲
„ অমৃতনাথ মুখোপাধ্যায়	„	৩৲
শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	„	২৲
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ রায়	„	৫৲
„ উপেন্দ্রনাথ বল	„	৬৲
„ জানকীলাল বসু	„	৩৲
„ জিতেন্দ্রনাথ দাস	„	২৲
শ্রীমতী বরদাসুন্দরী দেবী	„	২৲
„ দময়ন্তী দাস	„	২৲
শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	„	৩৲
মিসেস, প্রতিভা ঘোষ	„	২৲
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত	„	১॥০
পি, মুখার্জ্জি এস্কোয়ার	„	৬৲
শ্রীযুক্ত পরমানন্দ দত্ত	„	৩৲
মিসেস্ এস্, ঘোষ	„	২৲
শ্রীমতী শ্যামভাবিনী বসু	„	২৲
শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	„	৩৲
D. T. Tondwalkar Esqr.	„	৩৲
শ্রীযুক্ত বিপিনবেহারী মুখোপাধ্যায়	„	২৲
„ বেহারীলাল মল্লিক	„	৩৲
„ পান্নালাল দে	„	৩৲
„ নিত্যানন্দ চন্দ্র	„	৬৲
„ নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	„	২৲
„ এ, সি চট্টোপাধ্যায়	„	৩৲

রায় সাহেব শ্রীরাধাগোবিন্দ রায়	,,	৩৲
শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়	,,	২৲
,, বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	,,	২৲
,, চারুচন্দ্র বসু	,,	৩৲
H. Hydar Esqr.	,,	৩৲
শ্রীযুক্ত পি, এন, দত্ত	,,	৩৲
,, তারকনাথ রায় চৌধুরী	,,	২৲
B. P. D. Mittra Esqr.	,,	৩৲
শ্রীযুক্ত কমললোচন দাস	,,	৩৲
,, যতীন্দ্রনাথ পাল	,,	৩৲
,, পরমানন্দ দত্ত	,,	৩৲
শ্রীমতী প্রেমলতা দেবী	,,	২৲
মিসেস্ কিরণ বসু	,,	২৲
শ্রীযুক্ত নিজরাজ দাস	,,	৩৲
,, কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস	,,	৩৲
,, বিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	,,	৩৲
,, তুলসীদাস দত্ত	,,	৩৲
,, পান্নালাল মিত্র	,,	৩৲
		১০৯॥০

অগ্রিম।

মিসেস্ এস, হালদার	(১৮৪৮ শক)	২৲
শ্রীযুক্ত অমৃতনাথ মুখোপাধ্যায়	,,	।৴০
শ্রীমতী শ্যামভাবিনী বসু	,,	॥০
শ্রীযুক্ত পান্নালাল মিত্র	,,	৩৲
,, মদনমোহন সেন	,,	৩৲
,, বেহারীলাল মল্লিক	,,	৩৲
		১১৸৴০

১৮৪৮ শক—পৌষ মাস পর্য্যন্ত।

বকেয়া।

সম্পাদক রেঙ্গুণব্রাহ্মসমাজ (১৮৪২—৪৭ শক)	১৮৲
শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার গুপ্ত (১৮৪৬ শক)	১॥৶০
,, ,, (১৮৪৭ শক)	২৲
মিসেস্ জে, মুখার্জ্জি (১৮৪৭ শক)	২৲
শ্রীযুক্ত তারকনাথ প্রামাণিক (১৮৪৬—৪৭ শক)	৬৲
শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী বসু (১৮৪৩—৪৬ শক)	৮৲
,, ,, (১৮৪৭ শক)	২৲
,, প্রভাবতী দেবী (১৮৪৭ শক)	২৲
মিসেস রেণুকা গাঙ্গুলী (১৮৪৬ শক)	২৲
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৬—৪৭ শক)	৬৲
শ্রীমতী সুনন্দিনী দেবী (১৮৪৭ শক)	৫৲
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসাক (১৮৪৬—৪৭ শক)	৩৲
,, কাঙ্গালীচরণ দে (১৮৪৭ শক)	৩৲
শ্রীমতী হেমমালা বসু (১৮৪৭ শক)	২৲
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মল্লিক (১৮৪৬—৪৭ শক)	১২৲
,, হরিপদ ত্রিবেদী (১৮৪৬ শক)	১৲
রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু (১৮৪৭ শক)	৩৲
মিসেস্ এস, এন, বানার্জি (১৮৪৫ শক)	৬৲
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র পাল (১৮৪৭ শক)	২৲
শ্রীযুক্ত মদনচন্দ্র আচার্য্য (১৮৪৬—৪৭ শক)	৩৲
,, সুরেন্দ্র মোহন গুহ (১৮৪৫—৪৭ শক)	৬৲
শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দ (১৮৪৬—৪৭ শক)	৩৸০
শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর সেন (১৮৪৭ শক)	৩৲
মহামান্য ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন (১৮৪৭ শক)	২৪৲
	১২২॥৶০

হাল।

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়	(১৮৪৮ শক)	২৲
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বসন্তকৃষ্ণ বসু	,,	৩৲
শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী	,,	১৸৴০
মিসেস কিরণ বসু	,,	২৲
রায় সাহেব শ্রীরাধাগোবিন্দ রায়	,,	৩৲
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস দে	,,	২৲
B. P. D. Mittra Esqr.	,,	৩৲
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রপতি মুস্তফী	,,	৩৲
P. Mukerjee Esqr.	,,	৩৲
মিসেস্ এস্, এন্, ব্যানার্জি	,,	৩৲
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ	,,	২৲
শ্রীযতীন্দ্রকুমার বসু	,,	৩৲
শ্রীসুরেন্দ্রমোহন গুহ	,,	২৲
শ্রীসতীশচন্দ্র মল্লিক	,,	৬৲
শ্রীবিশ্বেশ্বর সেন	,,	৩৲
		৪১৸৴০

একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

ফাল্গুন, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

১০০৩ সংখ্যা ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৭। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩।

কর্ত্তব্য সাধন।

(৯৭ তম ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে)

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবানের নামে আমাদের সকলেরই হৃদয়তন্ত্রী আজ এই উৎসবের দিনে সমভাবে ঝঙ্কার দিয়া উঠুক। আজ এই উৎসবের দিনে আমরা দেশবাসী সকলকে—ধনী-দরিদ্র উচ্চ নীচ ও সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকলকেই সাদরে আহ্বান করিয়া বলিতেছি যে, সত্যধর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া সকলে একপ্রাণে মিলিত হও এবং মৈত্রীকে ব্যবহারের নিয়ামক কর। আজ এই নবজাগরণের দিনে সেই এক মাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকে একমাত্র প্রত্যক্ষ পিতামাতা জানিয়া জীবনকে ধন্য কর এবং মিলনের এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও—সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং—একসঙ্গে চল, একসঙ্গে কথা বল এবং পরস্পরের মন অবগত হও। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় মৈত্রীসাধনের যুগ আসিয়াছে। এখন মতামত লইয়া বিবাদবিসম্বাদের পরিবর্ত্তে মৈত্রীভাবের উপর দাঁড়াইয়া ভগবানের প্রিয়-কার্য্য সাধনে অগ্রসর হইতে হইবে।

বর্ত্তমান শুভ অবসরে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলিয়া সমস্ত বিবাদবিসম্বাদ ভুলিয়া ভগবানের প্রিয়কার্য্যসাধনে নির্ভয়ে অগ্রসর হও। তাঁহার অভয়বাণী আমাদিগকে প্রতি মুহূর্ত্তেই গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিতেছে—নিদ্রালস্য দূর করিয়া জাগ্রত হও, বিরোধবিবাদ দূর করিয়া শুভকর্ম্মে, কর্ত্তব্য-কর্ম্মসম্পাদনে আপনাকে নিযুক্ত কর। ইংরাজজাতি যেমন কথায় কথায় শতবিধ আকারে প্রকারে নেলসনের এই জাগরণবাণী পরস্পরকে শুনাইতে উদ্যত হয় যে, "ইংলণ্ড তাহার প্রত্যেক সন্তানকে কর্ত্তব্যসাধনের পথে দেখিতে আশা করে", আমরাও সেইরূপ ব্রহ্মের উপাসকমাত্রকেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এই জাগরণবাণী শুনাইয়া উৎসাহিত করিতে চাই যে, "ব্রহ্মোপাসকেরা কি জ্ঞানে, কি বিদ্যায়, কি ধর্ম্মে, কি অর্থে সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত না হইলে ব্রাহ্মসমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী'। শুভকর্ম্ম করিয়া যাও, কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়া যাও—ফলাফল ফলদাতা ভগবানের হস্তে সমর্পণ কর, দেখিবে, ব্রাহ্মসমাজ অচিরেই সর্ব্বত্র কিরূপ বিজয় লাভ করে।

ভগবদ্গীতায় একটী অমূল্য মহাবাণী সন্নিবিষ্ট দেখি, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার, ফলেতে কদাপি নহে। ব্রহ্মসাধনের পথে যিনিই অগ্রসর হইয়াছেন, তিনিই ইহার সার্থকতা উপলব্ধি করিবেন। ইহারই অনুরূপ বাণী বাইবেলের একটী সঙ্গীতেও দেখি। সেই সঙ্গীতের অর্থ হইতেছে এই যে, "ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সাধু-কার্য্যে অগ্রসর হও। তুমি যখন পৃথিবীতে আসিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আহার পাইবে। ভগবানেই তুমি আনন্দিত থাক, তিনিই তোমার হৃদয়ের বাসনা পূর্ণ করিবেন। ভগবানকে তোমার সকল কর্ম্ম নিবেদন কর এবং তাঁহার উপরেই একান্ত নির্ভর কর, তিনিই তাহা সফল করিবেন।" ইহা হইতে কেমন সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সকল দেশের সকল সাধকেরই ঐ একই উপদেশ।

ভগবদ্গীতায় ঐ যে কর্ম্মমাত্রে অধিকারবিষয়ক মহা-বাণী সন্নিবিষ্ট দেখি, ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, উহা কুরু-ক্ষেত্রের মহাসমরের মহাগর্জ্জন ভেদ করিয়াও সমুত্থিত

হইয়াছিল। এই বাণী সেই প্রলয়কালে প্রকটিত হইয়াছিল বলিয়াই ভারতবাসী সেই মহাপ্রলয়ের পরেও আজ পর্য্যন্ত জগত হইতে অন্তর্হিত হয় নাই; এবং নিজের উন্নত মস্তক উত্তোলিত করিয়া জগতের মহাসভায় নিজের উপযুক্ত স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিল। মুখে এই বাণী এতগুলি অক্ষরে প্রকাশ না করিলেও, অন্তত কার্য্যে যে দেশ যে জাতি এই বাণী অন্তরে ধারণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, সেই দেশ সেই জাতি যে মরিতে মরিতেও বাঁচিয়া উঠিবে, ইউরোপের জর্ম্মনি প্রভৃতি দেশ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অপর দিকে, আমাদের বর্ত্তমান অবনতিও এই বাণীর সত্যতা পদে পদে সপ্রমাণ করিতেছে। আমরা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনের পথে যতটা অগ্রসর হই বা না হই, প্রথমেই, কর্ম্মের ফলে কি লাভ হইবে, তাহাই গণনা করিতে বসি। আমাদের দৃষ্টি এখন কর্ম্মে অধিকারের প্রতি তত নয়, যত কর্ম্মফলের প্রতি, কর্ম্ম করিবার পরিবর্ত্তে কর্ম্মফলের জন্যই আমরা উন্মুখ। ইহার ফলে ভারতে মিথ্যার স্রোত বহিয়া চলিয়াছে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল বহুবিধ দুর্নীতি ভারতের সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিতেছে—ভারতভূমি অবনতির পথে নামিয়া চলিতেছে। কর্ম্ম না করিয়া কর্ম্মফলের জন্য উন্মুখতা আত্মবঞ্চনা বা আত্মঘাতী হওয়ার অতিরিক্ত কিছুই নয়। ইতিহাস সপ্রমাণ করে যে, আত্মবঞ্চনা করিয়া কোন ব্যক্তি বা জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ধীরভাবে আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, আত্মবঞ্চনার ফলেই আজ আমাদের পরস্পরের প্রতি সংশয় অবিশ্বাস জাগিয়া উঠিয়াছে; আমাদের ভিতরে স্নেহপ্রেম দয়াভক্তি অন্তর্হিত হইতে চলিয়াছে।

কর্ত্তব্য কর্ম্ম যদি না কর, তবে তোমাকে অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেই হইবে; শুভকর্ম্ম যদি না কর, তবে মন্দ কর্ম্ম করিতেই হইবে, কারণ মানুষ কর্ম্ম না করিয়া কখনই স্থির থাকিতে পারে না। এক টুকরো চৌরখণ্ডের জন্যও তোমাকে কর্ম্ম করিতেই হইবে, একমুঠো ভাতের জন্যও তোমাকে কর্ম্ম করিতেই হইবে, চিন্তা করিতেই হইবে। কর্ম্ম যখন আমাদের করিতেই হইবে, চিন্তার হাত যখন আমরা কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিব না, তখন, যিনি সকল মঙ্গলের নিদান, সেই ভগবান আমাদের অন্তরে যে শুভবুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন, আমাদের সকল কর্ম্ম সকল চিন্তা সেই শুভবুদ্ধিরই অনুগত করা উচিত।

কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া চল নির্ভয়ে শুভকর্ম্ম করিয়া চল। ফলাফলের ভার সেই অন্তরের গুরু মঙ্গলবিধাতার হস্তে সমর্পণ কর। কেবল এইটুকু বিশ্বাস হৃদয়ে অটল রাখিও যে, কল্যাণকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা কখনই দুর্গতি লাভ করেন না। সরল শুভবুদ্ধিতে ফলকামনারহিত হইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিতে থাকিলে তুমি স্বভাবতই মানুষের নিন্দাপ্রশংসার অতীত হইতে পারিবে এবং বীরপদক্ষেপে সংসারে বিচরণ করিতে পারিবে। আর, সত্য কথা বলিতে কি, তোমার কার্য্যের তুমি কি-ই বা ফল চাহিতে পার? তোমার দৃষ্টি কতটুকু? যে দেবাধিদেব সমগ্র বিশ্বজগতকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতেছেন, যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুপরমাণুরও পরস্পরের মধ্যে এক আশ্চর্য্য যোগবন্ধন স্থাপিত করিয়াছেন, মঙ্গলই যাঁহার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য, তোমার কার্য্যের ফলে তিনি যে মঙ্গল বিধান করিবেন, তাহা অপেক্ষা তুমি আর কি শুভফল আনিতে পারিবে?

সময়ে সময়ে আমরা সেই মঙ্গলবিধাতা বিশ্বপিতার মঙ্গলভাবের পরিচয় পাই, প্রেমহস্ত উপলব্ধি করি; আবার সময়ে সময়ে করি না। ৯১ বৎসর অতীত হইতে চলিল, রাজা রামমোহন রায় যখন কয়েকজন বন্ধুকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তখন, সেই ব্রাহ্মসমাজ সুদূর ভবিষ্যতে জগতের চিন্তাস্রোতে, ভারতের কর্ম্মক্ষেত্রে কি সুমঙ্গল বিপ্লব সাধন করিবে, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন মাত্র কয়েকজন বন্ধুকে লইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, সুদূর ভবিষ্যতে সেই দীক্ষাগ্রহণের ফলে কত লোকের জীবন যে পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহা কি তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন? ব্রাহ্মসমাজের সেই আদিম কালের মুষ্টিমেয় প্রচারকদিগের চতুর্দ্দিকে অগ্নিকণা ছড়াইবার ফলে স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি সাধু ভাবসকল আজ ভারতের অধিবাসীদিগের মর্ম্মে মর্ম্মে স্পর্শ করিবে, তাঁহাদের মধ্যে কেহই তাহা স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ।

আবার যখন সংঘবদ্ধ সেই মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মোপাসকদিগেরই ভিতর সহসা মতভেদজনিত বিরোধবিচ্ছেদের ভীষণ বহ্নি প্রজ্বলিত হইল, কে ভাবিয়াছিল যে, তাহারও ভিতরে এক সুমহান মঙ্গলসূত্র অনুস্যূত ছিল? শিশুর জন্মের পূর্ব্বে যেমন মাতার অনেক দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, অনেক অমূল্য সত্য প্রকাশিত হইবে বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজকে বিবাদ বিসম্বাদের দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই বিরোধবিবাদের কারণেই ব্রাহ্মসাধারণের মধ্যে সুমিষ্ট মিলনের প্রবল আকাংক্ষা আজ বহুকাল যাবৎ জাগিয়া উঠিয়াছে। সেই মিলনের বীজ আজ সুবৃহৎ মহীরুহে পরিণত হইয়া সমগ্র ব্রাহ্মসমাজকে আশ্রয়দানে উদ্যত হইয়াছে।

ইহা স্থির জানিও যে, বিবাদবিসম্বাদই কর আর

যাহা কিছু কর, তোমার অন্তরে যদি মঙ্গল ইচ্ছা থাকে, সাধুভাব থাকে, সত্যের উপর ধর্ম্মের উপর যথার্থ নিষ্ঠা ও নির্ভর থাকে, তবে ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন। ব্রাহ্মসমাজের লোকসংখ্যা মুষ্টিমেয় হইলেও পূর্ব্বতন আচার্য্য ও নেতাগণের অবিচলিত মঙ্গল ইচ্ছার কারণে, অন্তরের সদ্ভাবের কারণে, সত্যের উপর, ধর্ম্মের উপর, ভগবানের উপর একনিষ্ঠার কারণে তাঁহাদের প্রচারিত সত্যসকল আজ সমগ্র ভারতের অধিবাসীদের আদরের বস্তু হইয়াছে। ইহা ধ্রুব সত্য যে, কল্যাণ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা কদাপি দুর্গতি প্রাপ্ত হন না, অর্থাৎ কল্যাণজনক কর্ম্ম আজ হোক, কাল হোক, দুদিন পরে হোক, দশদিন পরে হোক, সুফলপ্রসূ হইবেই।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যানুকূল প্রচারের বর্ত্তমানে প্রশস্ত অবসর আসিয়াছে। দেশবাসীগণ সত্যধর্ম্মকে ঠিক ধরিতে না পারায় উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে নানা দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন যে, বাহিরের উচ্ছৃঙ্খলতার ভিতরে, দুর্নীতিপ্রবণতার ভিতরে, লঘুচিত্ততার ভিতরে দেশবাসীর অন্তরে এক সরল ও সবল ধর্ম্ম লাভ করিবার জন্য প্রবল আকাংক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। সত্যধর্ম্ম প্রচারের এমন শুভ অবসর অবহেলায় হারাইলে ব্রাহ্মসমাজ অমার্জনীয় অপরাধে অপরাধী হইবে। এই মহাজাগরণের সময়ে সকল ব্রহ্মোপাসকের আত্মপর ভুলিয়া গিয়া মিলিত হইয়া ব্রহ্মনামের মহিমা, সত্যধর্ম্মের বীজ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করাই কর্ত্তব্য।

সত্যই এখন আমরা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবি যে, এতদিন আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলাম—কেন? আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? আমাদের মধ্যে মূলগত কোনই প্রভেদ তো দেখিতে পাই না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আমাদিগকে এই যে বীজমন্ত্র দিয়াছেন—তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব—ভগবানকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন করাই তাঁহার একমাত্র উপাসনা—এই উদারতম ও সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক বীজমন্ত্র যখন প্রত্যেক ব্রহ্মোপাসকেরই অবলম্বনীয়, তখন ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে অন্যান্য অবান্তর বিষয়ে শত মতভেদ থাকিলেও বিবাদ বা মনোমালিন্য আসিবার কোনই অবকাশ নাই। আমাদের বুঝিতে হইবে যে, আমরা সত্যই এক ধর্ম্মের পতাকার নিম্নে একই পিতামাতার চরণ পূজার জন্য, তাঁহারই প্রবর্ত্তিত সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছি। ভগবান অনন্তস্বরূপ। তাঁহার অনন্তভাবের এক একটী কণা এক একটী নরনারীর অন্তরে বৈশিষ্ট্য লাভের চেষ্টা করিতেছে। এই কারণেই সংসারে প্রকৃত বৈচিত্র্য। ইহা বুঝিয়া প্রত্যেক ব্রহ্মোপাসকের কর্ত্তব্য—মতপার্থক্যের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধাপ্রদর্শন পূর্ব্বক সত্যধর্ম্মের মূল বীজে একমত হইয়া প্রাণের অন্তরে সদ্ভাবে মিলিত হওয়া, পরস্পরের উন্নতিতে সুখী হওয়া, পরস্পরের অবনতিতে দুঃখিত হওয়া। এই ভাবে ব্রহ্মোপাসকগণ একহৃদয় হইয়া ভগবানের নামপ্রচারে বহির্গত হইলে দিগ্বিজয়ীর বেশে ফিরিতে পারিবেন নিঃসন্দেহ; এই ভাবে পরস্পর যথার্থ মিলিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে কাহার সাধ্য?

মৈত্রীই নবযুগের যুগধর্ম্ম। আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, বর্ত্তমান যুগের জগদ্ব্যাপী কর্ম্মক্ষেত্রে পরস্পরের আন্তরিক মিলন ও অন্যোন্যসাহচর্য্য অপরিহার্য্য। এই প্রত্যক্ষ সত্য উপলব্ধি করিলেও আমরা দেখি না যে, আমাদের চারিদিকে বিবাদবিসম্বাদের বীজ কি প্রকার বিক্ষিপ্ত হইয়া আমাদের সমাজ ও দেশকে ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া চলিতেছে। এখানে মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে, হিন্দু মুসলমানের সঙ্গে, ব্রাহ্মণ পঞ্চমের সঙ্গে, পঞ্চম ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিলিতে চায় না। এই বিরোধ বিবাদ, মনের অমিল পরিত্যাগ না করিলে আমাদের শ্রেয় নাই। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, ভারতের পরাধীনতার অন্যতর কারণ হইতেছে আমাদের পরস্পরের মধ্যে মিলনের অভাব। এই মিলনের অভাববশতঃ আমাদের শুভকর্ম্ম সাধনের প্রচেষ্টাসকল ইচ্ছানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছে না এবং আমরা এত মলিন, এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি।

এই বিরোধবিবাদ এবং তজ্জনিত অবনতিস্রোতের প্রতিরোধক একমাত্র উদারতম ও অসাম্প্রদায়িক বীজমন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত সত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্মের দেবতা সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, ব্রাহ্মধর্ম্মের দেবতা সেই বিগতবিবাদং পরমেশ্বর। আজ শতাব্দীপ্রায় পূর্ব্বে যখন ভারতে গৃহবিবাদ অন্তর্বিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত করিয়াছিল, সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায়, ঐ বিগতবিবাদং পরমেশ্বর যাহার প্রাণ, সেই সত্যধর্ম্মকেই সর্ব্বপ্রকার গৃহবিবাদ দূর করিবার অব্যর্থ অস্ত্র এবং প্রাণের মিলনসাধনের এক অমোঘ উপায় জানিয়া তাহারই বীজ প্রোথিত করিয়াছিলেন, এবং তাহারই সাহায্যে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের একনিষ্ঠভাবে সেই কর্ত্তব্যকর্ম্মসাধনের ফলেই আজ প্রায় শতাব্দী পরে সেই সত্যধর্ম্মের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া ভারতবাসী জাগিয়া উঠিয়াছে, আজ সে মুক্তিলাভের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, আজ তাহার সকল রুদ্ধ শক্তি স্বাধীনভাবে স্ফূর্ত্তি পাইতে চলিয়াছে। তাঁহার একনিষ্ঠ তপস্যার ফলেই আজ ভারতবাসী মিলনের সুফল উপলব্ধি করিয়া মিলনের পথে অগ্রসর হইতেছে। সত্য-

ধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে যে ভারতবাসী শত শত শ্রেণী-ভেদের কারণে পরস্পরকে অস্পৃশ্য ভাবিয়া পরস্পরের প্রতি সহায়হস্ত বিস্তারে পশ্চাৎপদ ছিল, সেই ভারতবাসী আজ সত্যধর্ম্মের অন্তঃস্ফুরণের প্রভাবে পরস্পরকে ভাই বলিয়া চিনিতে শিখিয়াছে; সকলের ভিতর মনুষ্যত্ব—অন্তর্নিহিত ব্রহ্মাগ্নি উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে। আজ সেই ভারতবাসী পরস্পরকে একই পিতামাতার সন্তান জানিয়া মিলিতভাবে বিশ্বসভার মাঝে নিজেদের জন্য একটা উচ্চ আসন অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে।

সত্যধর্ম্ম প্রচারের যে শুভ অবসর আসিয়াছে, এই শুভ অবসরে আমাদের নিদ্রিত থাকিলে চলিবে না। আমোদপ্রমোদের মোহে, ঘুমের ঘোরে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলে আমাদের মৃত্যুকেই বরণ করিতে হইবে। এই জাগরণের মুখে আমাদেরও যেমন জাগিয়া উঠিতে হইবে, তেমনি স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে, ব্রাহ্মণপঞ্চমনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীকেও জাগরণমন্ত্র দিতে হইবে, এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতিসাধনে সহায়তা করিতে হইবে। যতদিন এই ভারতভূমি পুরাকালের ন্যায় জগতের মহাসভায় উপযুক্ত উচ্চ আসন অধিকার না করে, ততদিন বৃথা আমোদপ্রমোদের কথা মুখেও আনিও না; পদতলে দলিত করিয়া দাও নৃত্যগীতের কথা; সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া ফেল। যে সত্যধর্ম্মের উৎস হইতে এই জাগরণের বন্যা নামিয়া আসিয়াছে, সেই সত্যধর্ম্মের প্রবর্ত্তক পরব্রহ্মকে বিগতবিবাদং পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহার সত্যধর্ম্মের বিজয়-বার্ত্তা সর্ব্বত্র ঘোষণা কর—বিবাদবিসম্বাদ ঘুচিয়া যাক, এবং মিলনের সুমঙ্গল বায়ু প্রবাহিত হোক।

যে ব্রাহ্মসমাজ হইতে এই সত্যধর্ম্মের বাণী আমাদের গৃহে গৃহে প্রচারিত হইয়াছে, যে ব্রাহ্মসমাজ হইতে আমরা সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সুমঙ্গল বার্ত্তা কর্ণে জপমন্ত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই ব্রাহ্মসমাজকে না বাঁচাইয়া রাখিলে আমাদের আশ্রয়স্থল কোথায়? আর, যদি সেই ব্রাহ্মসমাজকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাও, তবে হিংসাদ্বন্দ্ব ভুলিয়া গিয়া ছোটখাটো মান অভিমান ভুলিয়া গিয়া, উচ্চনীচ ক্ষুদ্রবৃহতের ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়া পরস্পর মিলিত হও। সকল ভাইকে প্রেমের কঠিন-কোমল বন্ধনে বাঁধিবার জন্য অগ্রসর হও। সংশয়াত্মা সংসারী লোকের কথায় বিচলিত হইও না। আমাদের যিনি একই পিতামাতা, তিনি আমাদের প্রত্যেকের আত্মাতে সমাসীন থাকিয়া আমাদিগকে ক্রমাগত বলিতেছেন—বিচ্ছিন্ন থাকিও না—মিলিত হও। ঐ অনন্ত আকাশ হইতে সেই মঙ্গলবাণীরই প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে ক্রমাগত বলিতেছে—মিলিত হও—মিলিত হও।

ব্রাহ্মসমাজকে যদি উন্নতির শিখরদেশে দাঁড় করাইতে চাও, তবে বৃথা আলাপ বাজে কথা ছাড়িয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সেই জাগরণবাণী অন্তরে ধারণ কর। জ্ঞানে বড় হও, ধর্ম্মে বড় হও, কর্ম্মে বড় হও। অধর্ম্মের সহিত সংগ্রামে যদি জয়লাভ করিতে চাও, সন্তানসন্ততির যদি প্রকৃত উন্নতি দেখিবার আশা কর, তবে সকল ব্রহ্মোপাসক ভগবানের পদতলে সমবেত হইয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ কর। সত্যেতে একনিষ্ঠ হইয়া তাঁহার চরণে হৃদয়ের সমুদয় প্রীতি সংন্যস্ত কর; এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য জানিয়া, মিলনের সর্ব্বপ্রধান উপায় জানিয়া এবং তোমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য জানিয়া কায়মনোবাক্যে সত্যধর্ম্মের প্রচারে যত্নবান হও; ব্রাহ্মধর্ম্মকে জয়যুক্ত কর। যে জন্মভূমি আমাদের পূজার পাত্র, সেই জননী জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠুক; সকল দুঃখদৈন্য বিদূরিত হোক।

নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত।

প্রাতঃকাল।

ভৈরব—চৌতাল।

তুমি হে জগপতি দেব বুদ্ধিদাতা।
আছ করি' সব পূর্ণ।
যে-ই যে-ই চাহে, সে-ই সে-ই তোমা পায় হে।
ভক্তিকুসুম লহ প্রেমচন্দ্র!
সর্ব্বেশ্বর নাম তব গাহে কত শত
সুর নর তিন লোকে।
—মম চিত্তে গীত নবছন্দ জাগি' উঠে
তব অঙ্কিত
অপরূপ হেরি' চারি দিশি শোভা,
হে সর্ব্ববান্দিত॥

কি. না ঠা.

আশা ভৈরবী—তেওরা।

এই আলোর ভরা অসীম আকাশ
সূর্য্য-কিরণ ঢালা
চিত্তে আমার বাজায় বাঁশি
বসায় মধুর মেলা।
প্রভাত-পাখীর এই কলতান
চিত্তে জাগায় সুপ্ত সে গান
ফুলের রাশি—জাগায় হাসি
ভরায় কুসুম-ডালা।
এ আনন্দ সভা মাঝে
চিত্ত আমার গানে বাজে
হৃদয়-বাহির জুড়ে কেবল
সেই অরূপই রূপে রাজে।
সেই একে আজ প্রণাম করি
গগন-ভুবন গানে ভরি—
মধুর করে কাটাই জীবন
ভুলি বেদন-জ্বালা॥

দি. চ. ব

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

তুমি আমাদের থাকতে সহায়
করব না ভয়—করব না ভয়
ঝড়ের রাতি সেও পোহায়—
করব না ভয়—করব না ভয়।
ঘনাক্‌ না ঘোর আঁধার রাতি
থাকতে মোদের সাথের সাথী
কে নেভাবে প্রাণের বাতি
অমর ভাতি জ্যোতির্ম্ময়—
ব্যথার প্রদীপ – সেও আলো দেয়
করব না ভয়—করব না ভয়॥
ভবার্ণবের ভেলা তুমি
করব না ভয়—করব না ভয়
অন্ধকারের ধ্রুবতারা
করব না ভয়—করব না ভয়।
অভয় মনে হাস্যমুখে
চলব সকল দুঃখে সুখে
তোমার নামটি লয়ে বুকে
গেয়ে যাব প্রেমেরই জয়—
পড়ব শেষে—পায়ে এসে
করব না ভয়—করব না ভয়॥

নি. চ. ব.

সায়ংকাল।

• • •

পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে।
পিছিয়ে পড়েছি আমি যাব যে কি করে?
এসেছে নিবিড় নিশি,
পথ রেখা গেছে মিশি,
সাড়া দাও সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে॥
ভয় হয় পাছে ঘুরে ঘুরে
যত আমি যাই তত যাই চলে দূরে।
মনে করি আছো কাছে,
তবু ভয় হয়, পাছে
আমি আছি তুমি নাই কালি নিশি ভোরে॥

র. না. ঠা.

• • •

আর রেখো না আঁধারে
আমায় দেখতে দাও
তোমার মাঝে আমার আপনারে
আমায় দেখতে দাও।
কাঁদাও যদি কাঁদাও এবার
সুখের গ্লানি সয়না যে আর
নয়ন আমার যাক না ধুয়ে অশ্রুধারে॥

জানি না তো কোন্‌ কালো এই ছায়া।
আপন বলে ভুলায় যখন ঘনায় বিষম মায়া।
স্বপ্নভারে জমল বোঝা,
চির জীবন শূন্য খোঁজা,
মোর আলো লুকিয়ে আছে
রাতের পারে।

র. না. ঠা.

• • •

আপনি আমার কোন্‌খানে
বেড়াই তারি সন্ধানে।
নানান রূপে নানান বেশে
ফেরে যে-জন ছায়ার দেশে
তার পরিচয় কেঁদে হেসে
শেষ হবে কি কে জানে॥
আমার গানের গহন মাঝে শুনেছিলেম যার ভাষা
খুঁজে না পাই তার বাসা।
বেলা কখন যায় গো বয়ে,
আলো আসে মলিন হয়ে,
পথের বাঁশী যায় কি কয়ে
বিকেল বেলার মূলতানে॥

র. না. ঠা.

• • •

তুমি যে আমারে চাও
আমি সে জানি।
কেন যে মোরে কাঁদাও
আমি সে জানি॥
এ আলোকে এ আঁধারে কেন তুমি আপনারে
ছায়াখানি দিয়ে ছাও আমি সে জানি॥
সারাদিন নানা কাজে কেন তুমি নানা সাজে
কত সুরে ডাক দাও আমি সে জানি॥
সারা হলে দেয়া-নেয়া দিনান্তের শেষ খেয়া
কোন্‌ দিক পানে বাও আমি সে জানি॥

র. না. ঠা.

শ্যাম—একতালা।

পরাণ জাগিল রে—
উৎসবপরশে আজি মোর।
চারি দিশি হরষ জাগিয়া হেরি—
সুগন্ধ বহে বায়ু মলয়া
ভরিয়া গগনে রে।
জয়গান তব উঠে শতকণ্ঠে আজি
দশদিশি বেজে রে।
তারি তানে তানে গাহে প্রাণ শত গান
নরনারী আকুলিয়া প্রীতিসরস সুতানে রে॥

ক্ষি. না. ঠা.

মিশ্র বেহাগ—দাদ্‌রা।

আপনি যখন হৃদয়ে ফুল ফুটবে না—তুমি এসো।
শুষ্ক যখন জীবনে গীত উঠবে না—তুমি এসো।
জীবন যখন হবে মরু, রইবে না তায় একটী তরু
(যখন) অন্ধ কান্না ঠেকবে ধরা—তুমি এসো।
কান্না যখন বক্ষে আমার বন্যা ব'বে—তুমি এসো।
বিফল যখন লাগবে জীবন মাগবে মরণ—তুমি এসো।
নিমেষে ফুল ফুটিয়ো তবে, সুধার উৎস ছুটিয়ো তবে
(আমার) কান্নাজলে পান্নাদোলায়—তুমি এসো।
তুমি আমার জীবনে কি—কইতে আমি পারি সে কি?
সব গীতি যে বন্ধ সেথায়—সকল কথা কথার ফাঁকি।
তুমি আমার জীবনে কি—আমি বিনে জানবে কে কি?
(তোমার) চরণতলে সব বিকানু—তুমি এসো।

নি. চ. ব.

খাম্বাজ—ঠুংরি।

তাঁহারে আজিকে ডাক মন!
ভকত সভার মাঝে
শতধারে ঝরে
আশীষ তাঁহারি—দুখ হরে।
গরজি উঠিছে হিয়ে
অভয় তাঁর বাণী
সকল নাশি' হানি
ভয় ভকতেরি।
নাথ নাথ বলি'
শোক তাপ ভুলি'
তাঁর পদ ধরি' রও
চিরতরে।
আনন্দ উছলিছে—
ধরিয়া কেবা রাখে—
শোন গো শোন ডাকে
ওই জয়ভেরী।
জয় রব করি'
এসো ছুটে চলি;
পাছে পড়ে নাহি রও
পথপরে॥

ক্ষি. না. ঠা.

আড়ানা—চৌতাল।

প্রাণের মাঝারে ঝরিছে আজ
নয়ন-আসার হে—শান্ত করি' দাও।
মম হৃদি-সিংহাসনে এসো এসো দেব!
কৃপা করি' শান্তিবচন হে শুনাও।
তব বদনজ্যোতি প্রাণে হেরিয়া
দুখ-সাগর পাশরিব,—তব পদে প্রভু রাখ আমায়।
তুমি ত্রিভুবন-রঞ্জন—তুমি কঠিন দুখভঞ্জন।
মহেশ তুমি সবার সুখদায়ী॥

ক্ষি. না. ঠা.

বাহার—একতালা।

বিশ্বেশ্বর-মন্দিরে এই কে রহিবে নিরানন্দ?
উথলে যে হেথা চির-উৎসব বহে হেথা চিরানন্দ।
ফুল ফোটে হেথা গাহে পাখী
কুঞ্জে কুঞ্জে মুঞ্জরে শাখী
গুঞ্জরে অলি—ধায় নদী
বহে বায় ফুল-গন্ধ।
দুঃখেরে মোরা ডাকি, মোহঘোরে সদা থাকি
জীবনে মরণে পরম দেবতা, তাঁরে সদা পিছে রাখি।
তাঁরে রেখে হৃদে সাধিলে কাজ
কোথায় দুঃখ—কোথায় লাজ,
চির আনন্দ করে বিরাজ
টুটে যায় মোহবন্ধ॥

নি. চ. ব.

রাগিণী সিন্ধু বারোয়াঁ—তাল ঠুংরি।

প্রাণ-মন ডুবানো এমন
কেহ নাই রে—কিছু নাই রে!
জুড়াতে এমন বেদন-দহন
কেহ নাই রে—কিছু নাই রে!

আঁধার হৃদয়ে দিতে আলো
নিমেষে ঘুচাতে সব কালো
সব দিকে এত ভালো
কেহ নাই রে—কিছু নাই রে!

ঢালিতে সুধা বিষজ্বালায়
ভরিতে কুসুম হৃদি-ডালায়
সাজাতে গেহ প্রীতি-মালায়
কেহ নাই রে—কিছু নাই রে!

এস সবে তাঁরে নমি
'তিনি' ধনে হই ধনী
এ হেন পরশমণি
কেহ নাই রে—কিছু নাই রে!

নি, চ, ব,

ঝিঁঝিটখাম্বাজ—যৎ।

হৃদয়ে তোমারি নাম নিরখি নিতিপ্রকাশ—
চন্দ্র কোটী ভানু কোটী কোটী তারকভাস।
শক্তি হে অতুল তব এ সুন্দর তব সৃজন।
তোমার বিশ্ব ভকতমুখে ভক্তি-উজল ঘন।
গিরি-কন্দর ধ্বনিয়া উঠে তোমারি নামগানে।
তোমারি দেব শির' পরি শশীতপন শোভে।
নব জলধরে হে তড়িতছটা গলে তব মালা শোভে।
হেরি অপরূপ রূপ জগজন মন মোহে।

ক্ষি, না, ঠা,

খাম্বাজ—তাল ফেরতা।

শঙ্কর শিব সঙ্কটহারী
নিস্তার প্রভো—
জয় দেবদেব!
আকুল প্রাণে আমারি
ভকত-চিত্ত-বিহারী!
দেখা দাও
ভিক্ষা মাগি—
জয় দেব দেব।
পিপাসিত-চিত্ত-বারি!
ত্রিলোক-জগৎধারি!
দীননাথ
দয়াসিন্ধু
জয় দেব
ওহে সংসারকাণ্ডারী!
আশ্রিতভয়হারী!
ভবপারে
যাও লয়ে—
জয় দেবদেব!

ক্ষি, না, ঠা,

রামপ্রসাদী।

পাল্ তুলে দাও, ভাসাও তরী॥
ডাক্ এসেছে ওপার হ'তে,
মায়ের ঘরে হবে যেতে,
(সবাই) আনন্দেতে, হৃদয় ভরে,
একমনে যায় গো চলি!
ওপারেতে দেখ্ না চেয়ে,
আলোয় আলোয় যাচ্ছে ছেয়ে,
(সেই) আলোর নাচে, স্রোতের মাঝে
ছুট্‌ছে তরী হেলি দুলি।
ভাসা মেঘে চাঁদের মত,
ঢেউয়ের পরে হাঁসের মত,
(আমার) পাগল হয়ে হৃদয় ছোটে—
কে আর তারে রাখবে ধরি।
সারা পালে লেগেছে বায়,
জোয়ার জোরে ঠেলেছে নায়,
এমন সুযোগ দিয়ে ছেড়ে
রোস্‌নে কো তুই পাছে পড়ি
(হোথা) সাঁঝের আগে হবে যেতে
চল্‌রে ধরে অভয় হরি॥

ক্ষি, না, ঠা.

কুশারিকথা ও রাঢ়ীবারেন্দ্রভেদ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১০। ভট্টনারায়ণের বংশের "গাঁই"।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে, ভট্টনারায়ণের একুশ পুত্রের মধ্যে ১৬জন পুত্র রাঢ়ে বসতি করিয়াছিলেন (১)। কুলতত্ত্বার্ণব বলেন, সেই ষোড়শ পুত্র ১৬টী গ্রাম পাইয়া "গাঁই" হইয়াছিলেন—বন্দ্য, কুসুমকুলি, কুলভি, গড়গড়ি, ঘোষাল, সেউ, দীর্ঘ, কড়ি, মাস, বড়াল, কেশরকোণি, পারি, বসু, কুশো, ঝিক এবং বোকট্টাল (২)। এইগুলি গ্রামের নাম, এবং গ্রামের নাম হইতেই গাঁইয়েরও উৎপত্তি হইয়াছে। গ্রামের নাম বলিয়াই বিভিন্ন গ্রন্থে অল্পস্বল্প নামপার্থক্যও দেখা যায়। কুলদীপিকায় নিম্নোক্ত কয়েকটী নামে পার্থক্য দেখা যায়—কুসুমকুলির স্থলে কুসুম, দীর্ঘর স্থলে দীর্ঘাঙ্গী, ঘোষালের স্থলে ঘোষলী, বড়ালের স্থলে বটব্যাল, কড়ির স্থলে কুলী, গড়গড়ির স্থলে গড়, সেউর স্থলে সেয়ক, কুশোর স্থলে কুশারি, কেশরকোণির স্থলে কেশরী, বসুব স্থলে বসুয়ারি, ঝিকর স্থলে আকাশ (?) এবং বোকট্টালের স্থলে করাল (?) (৩)।

আমাদের দেশে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে, "পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, তা ছাড়া বামন নাই।" ইহার মধ্যে অবশ্য ভট্টনারায়ণের ১৬ গাঁই অন্তর্ভুক্ত আছে। কিন্তু বারেন্দ্রদিগের ভিতর এই

(১ ও ২) কু. ত. ১০২—১০৩ শ্লোক।
(৩) স. নি. ২০।
(৪) বারেন্দ্রবংশাবলী—রামধন তর্কপঞ্চানন—স. নি. ৫৮০।

ছাপ্পান্ন গাঁইযের একটাও প্রচলিত নাই। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায যে, ভট্টনারায়ণ ও তাঁহার ঐ ১৬ গাঁই পুত্র ভূশূরের সময়ে রাঢ়ে চলিয়া আসিবার পরই গাঁইয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। উক্ত প্রবাদের মধ্যে কেহ কেহ রাঢ়ীবারেন্দ্রের মধ্যে বিদ্বেষের গন্ধ পান। আমরা তাহা মনে করি না। উক্ত প্রবাদ কেবল রাঢ়ীদিগের সম্বন্ধেই উক্ত হইযাছে, বারেন্দ্রদিগের সম্বন্ধে তো উহা প্রযুক্তই হয় নাই, তথন উহা বিদ্বেষভাবপ্রণোদিত কি প্রকারে বলা যায? সম্বন্ধনির্ণযকার তাঁহার গ্রন্থের ৩৮৬ পৃষ্ঠায ভট্টনারাযণের পুত্ররূপে যে ষোলটী নাম দিযাছিলেন, তাহার সহিত অন্যান্য গ্রন্থোক্ত কতক-গুলি নামের সাদৃশ্য নাই। তিনি সেগুলি কোথায় পাইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বারেন্দ্রবংশাবলীতে পাওয়া যায যে, ক্ষিতীশের দুই তনয—নারায়ণ ও দামু (দামোদর); তন্মধ্যে নারাযণের পুত্র ১৬—সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইলেন রামু।

"কেহ বলে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ওঝা হন আদি।
কেহ কহে বরাহই শ্রেষ্ঠ সর্ব্ববাদী॥" (৪)

অন্য কোন গ্রন্থে কিন্তু আমরা রামকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া উল্লিখিত দেখি না।

১০১। কে কোন্ গাঁই?

বাচস্পতি মিশ্রের অনুসরণ করিয়া সম্ভবত আনন্দভট্ট তাঁহার বল্লালচরিতে স্পষ্টরূপে বলিয়া দিযাছেন—কে কোন্ গাঁই হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে—আদিবরাহ বন্দ্য, রাম গড়গড়ি, নীপ (বাচস্পতির মতে নৃপ) কেশরী, নান কুসুমকুলি, বটু (বাচস্পতির মতে বাটু) পারিহাল (কুলদীপিকার মতে পারি), গুই কুলভি, গণ ঘোষলি (কুলদীপিকার মতে ঘোষাল), শান্তেশ্বর (বাচস্পতির মতে সান্তেশ্বর?) সেয়ু, বুড়ো মাশ্চটক (কুলদীপিকার মতে মাস), বিকর্ত্তন বটব্যাল, নীল বসুয়ারি, মধুসূদন করাল, কোয় (বাচস্পতির মতে কোয়র) কুশারি, বাসু কুলিশ (কুলদীপিকার মতে কুসী এবং বাচস্পতির মতে কুলকুলি), মাধব আকাশ, এবং মহামতি দীর্ঘগ্রামী (কুলদীপিকার মতে দীর্ঘাঙ্গী), (৫)। ইহার মধ্যে আটটী গাঁই সম্বন্ধে বিভিন্ন কুলগ্রন্থে কিছু মতভেদ দৃষ্ট হয়। হরিমিশ্র ও রাজভাটের মতে—মহামতির (আনন্দভট্টের মতে) স্থলে গুঠ দীর্ঘাঙ্গী; রাজভাটের মতে মহামতি বটব্যাল; হরিমিশ্রের মতে গূঢ় (রাজভাটের মতে গণ) মাশ্চটক; হরিমিশ্রের মতে নিনো (রাজভাটের মতে বিকর্ত্তন) বসুয়ারি; হরিমিশ্রের মতে দেব (রাজভাটের মতে সাহু বা সাঢ়ু) সেউ; হরিমিশ্রের মতে দীন কুশি (রাজভাটের মতে নিহ্নো কুশারি); হরিমিশ্রের মতে কাম ঝিকরাড়ি; রাজভাটের মতে শুভ কুলকুলি; হরিমিশ্রের মতে সোম বোকট্টাল, রাজভাটের মতে বিভু আকাশ (৬)। কুলতত্ত্বার্ণবের মতে বরাহ বন্দ্যঘটী, নান কুসুমকুলি, গুয়ি কুলভি, রাম গড়গড়ি, গণ ঘোষলী, দেব সেউড়ি, মাধব দীর্ঘবাটী, মধুসূদন কড়িল, গূঢ় মাশ্চটক, বিকর্ত্তন বটব্যাল, নৃপ কেশরকোণি, বাটু পারিহাল, নীল বসুয়ারি, দীন কুশারি, কাম ঝিকরাড়ি, বাসুদেব বোকট্ট। (কু০ ত০ ১১২—১১৫ শ্লোক)।

১০২। প্রথম কুশারি কে?

আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিযা আসিলাম যে, ভট্টনারায়ণেরই এক পুত্র কুশারি গ্রাম লাভ করিয়া কুশারি গাঁইয়ের প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নাম সম্বন্ধেও বিভিন্ন কুলগ্রন্থে বিভিন্ন মত দেখি। হরিমিশ্রের এবং কুলতত্ত্বার্ণবের মতে দীন, বল্লালচরিতের মতে কোয়, রাজভাটের মতে নিহ্নো এবং 'ঠাকুরগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত বিবরণে'র মতে নৃসিংহ বা নান্নু কুকশারি গাঁইয়ের মূল (৭)। কুলশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ৺শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাচস্পতি মিশ্রেরই অনুসরণ করিযা কোয়কেই কুশারি বলিযাছেন (৮)। কুলতত্ত্বার্ণবে দীন প্রথম কুশারি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (৯)। আমা-

(৪) স০ নি০ ২৩পৃঃ, ব্রা০ কা০ ১২৩পৃঃ।

(৬) আদিবরাহ বাঁড়ুরী গড়গড়ি রাম।
নীপ কেশরকুণী নান যে কুসুম॥
পারিহা বটুক মুনি কুলভিতে গুঁই।
পশুপতি দীর্ঘবাড়ী, বিকে বন্ন কই।
মহামতি বটব্যাল. বিভু আকাশে বলি।
সাহ (সাঢ়ু) ও সেয়ক শুভ কুলকুলী॥
নিহ্নো কুশার অরি, মধু করালে যান।
গুণমণি ঘোষলীর গাঁয়ে অবস্থান॥
ভট্টনারায়ণ মুনি ষোল পুত্র পান।
তার মাঝে গণপতি মাসচটে যান॥
রাজভাটের কাহিনী—স০ নি০ ২৯২পৃঃ।

(৭) Tagore Family ৫পৃঃ।

(৮) রা০ ব্রা০। (৯) কু০ত০ ১১৫ শ্লোক।

দেরও মনে হয় যে যাঁহার নাম দীন, তাঁহারই ডাকনাম কোষ ও নিহ্লো ছিল। কুলশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ষষ্ঠ বৎসর ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা "কল্পনা" মাসিক পত্রে যে বংশাবলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোয়কেই আদিকুশারি বলিয়া তাঁহাকেই নিহ্লো বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

১০৩। কুশারি গ্রাম কোথায়?

কুশগ্রাম হইতে কুশারি বা কুশাড়ি গ্রাম হইয়াছে। এই গ্রামকে এখন সাধারণে 'কুশো' বলে। বর্দ্ধমান জেলায় বর্দ্ধমান সহর হইতে ৩ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে ও গোবিন্দপুর হইতে ¾ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত (অক্ষাং ২৩°১৬´ ১৫´´ উঃ ও দ্রাঘিং ৮৮°১´ ১৫´´ পূঃ) (১০)।

১০৪। কুশারিদিগের অবস্থান কোথায়?

বাঁকুড়ায় সোণামুখী, ঢাকাজেলায় পিঠাভোগ ও কয়কীর্ত্তন, যশোহরে দামুরহুদা, খুলনাজেলায় ঘাটভোগ প্রভৃতি স্থানে কুশারিদিগের অনেকের প্রধান বাসস্থান ছিল। কয়কীর্ত্তন ও পিঠাভোগের কুশারিরা গোষ্ঠীপতির বংশ (১১)।

১০৫। কুশারিগণ সিদ্ধ শ্রোত্রিয়।

আমরা উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণের বহু সন্তানসন্ততির মধ্যে ৫৬জন ৫৬টী গ্রাম পাইয়া ৫৬ গাঁই প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই ৫৬ গাঁইয়ের মধ্যে কয়েক জন কৌলীন্য প্রাপ্ত হইলেন, কয়েক জন সিদ্ধ শ্রোত্রিয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন এবং কয়েকজন গৌণ কুলীন হইলেন। তৎসঙ্গে এই একটী নিয়মও স্থাপিত হইল যে, কুলীনেরা কুলীনেরই সঙ্গে আদানপ্রদান করিবেন; শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করিতে পারিবেন না, করিলে কুলভ্রষ্ট ও বংশজভাবাপন্ন হইবেন; আর, গৌণ কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিলে এককালে কুলক্ষয় হইবে—এই নিমিত্ত গৌণকুলীনেরা অরি অর্থাৎ কুলের শত্রু বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন (১২)। দুএকটী বংশ ব্যতীত সাধারণত কুশারিগণ সিদ্ধ বা সৎ শ্রোত্রিয় মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিলেন (১৩)। "কালক্রমে গৌণকুলীনেরা শ্রোত্রিয়শ্রেণীতে নিবেশিত হইলেন। কিন্তু সর্ব্বাংশে শ্রোত্রিয়দিগের সমান হইতে পারিলেন না। প্রকৃত শ্রোত্রিয়েরা শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ও গৌণকুলীনেরা কষ্টশ্রোত্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হইতে লাগিলেন (১৪)।" এই প্রবাদ সুপ্রসিদ্ধ যে, বল্লালসেনই এই সকল ব্যবস্থার মূল প্রবর্ত্তক। আমরা এই সকল বিষয়ে সুবিস্তৃত আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না, কারণ এগুলি আমাদের মূল বিষয়ের বাহিরে। তবে এ বিষয়ে একটী কৌতূহলজনক আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া মনে করি।

১০৬। কৌলীন্যপ্রবর্ত্তনের আখ্যায়িকা।

"রাজা বল্লালসেন কৌলীন্যব্যবস্থাপনের দিন স্থির করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে রাজসভায় উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। তাহাতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ এক প্রহরের সময়, কতকগুলি দেড় প্রহরের সময়, আর কতকগুলি আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন। যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন, তাঁহারা কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন; যাঁহারা দেড় প্রহরের সময়, তাঁহারা শ্রোত্রিয়; আর যাঁহারা এক প্রহরের সময় আসিলেন, তাঁহারা গৌণকুলীন হইলেন (১৫)।" এই আখ্যায়িকা সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া মনে হয় না, কারণ এই প্রণালীতে মর্য্যাদার বিভাগ হইলে পরস্পরের মধ্যে একেবারে আদানপ্রদান বন্ধ হইবে, তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। যাই হৌক, উপরোক্ত আখ্যায়িকার ভাবার্থ এই যে, যে ব্রাহ্মণ যত শীঘ্র রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, ধরিয়া লওয়া হইল যে, তিনি রাজসভায় উপস্থিত হইবার জন্য নিত্যকর্ত্তব্য অনুষ্ঠানের প্রতি তত বেশী অমনোযোগী হইয়াছিলেন।

১০৭। রাঢ় ও বরেন্দ্র।

বঙ্গদেশে, কি পূর্ব্ববঙ্গে, কি পশ্চিমবঙ্গে, শাণ্ডিল্যপ্রমুখ পঞ্চগোত্রের যে সকল ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে রাঢ়ী ও বারেন্দ্রভেদ দেখা যায়—

(১০) ব্রাং কাং ১২০পৃঃ।
(১১) ব্রাং কাং ৩১৩পৃঃ; সং নিং ৩৭৩পৃঃ।
(১২) কুলরমা ও কুলকুণ্ডলিনী—সং নিং ৬০১পৃঃ।
(১৩) ব্রাং কাং ১০৪পৃঃ।
(১৪) সং নিং ৩ ৫পৃঃ।
(১৫) সং নিং ৩০৫পৃঃ।

পাঁচ গোত্রেরই ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেখা যায় যে, রাঢ়ীও আছেন, বারেন্দ্রও আছেন। ইহা তো প্রসিদ্ধই আছে যে, ক্ষিতীশপ্রমুখই হৌন বা ভট্টনারায়ণপ্রমুখই হৌন, যে পঞ্চব্রাহ্মণ আদিশূরকর্ত্তৃক বঙ্গদেশে সমানীত হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্যে কেহ কেহ বা রাঢ়ী এবং কেহ কেহ বা বারেন্দ্র হইয়াছিলেন। এই রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের ভেদ রাঢ় ও বরেন্দ্রদেশ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। যাঁহারা রাঢ়ে গিয়াছিলেন, তাঁহারা রাঢ়ী হইলেন; যাঁহারা বরেন্দ্রভূমিতে বাস করিলেন, তাঁহারা বারেন্দ্র হইলেন। প্রেমবিলাস বলেন—জাহ্নবীর পশ্চিম পার রাঢ় এবং উহার পূর্ব্ব তীর ও পদ্মার উত্তর তীর বরেন্দ্র; তন্মধ্যে পদ্মার দক্ষিণ পার রাঢ়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ। গঙ্গার পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার লইয়া গৌড়রাজ্য (১৬)।

১০৮। রাঢ়ী কাহারা হইলেন?

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, প্রেমবিলাসের মতে ক্ষিতীশের সাত পুত্র এবং সেই সাত পুত্রের মধ্যে, প্রেমবিলাস বলেন, দামোদরের সন্তান বরেন্দ্রে থাকিলেন এবং শৌরি প্রভৃতি পাঁচ জনের সন্তান রাঢ়দেশে গমন করিলেন। এতদ্ব্যতীত, ভট্টনারায়ণের প্রথম পত্নীজাত পাঁচ সন্তানই বরেন্দ্রে থাকিলেন; অবশিষ্ট দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্নীর গর্ভজাত ষোল সন্তান রাঢ়ে আসিয়া বাস করিলেন (১৭)। কুলতত্ত্বার্ণবেরও মতে দেশের নাম অনুসারেই রাঢ়ী-বারেন্দ্রভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি যাঁহারা রাঢ়ে গেলেন, তাঁহারা রাঢ়ী হইলেন; এবং দামোদরপ্রমুখ যাঁহারা পূর্ব্ববাস অর্থাৎ বরেন্দ্রদেশ ত্যাগ না করিলেন, তাঁহারা বারেন্দ্র হইলেন (১৮)।

১০৯। ভেদের কারণ কি?

কেহ কেহ বলেন, ভ্রাতৃগণের পরস্পরের মধ্যে অপ্রণয় হইবার কারণেই কয়েকজন রাঢ়দেশে চলিয়া আসেন (১৯)। আমাদের তাহা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। রাঢ়ীবারেন্দ্রভেদ এক সময়েই ঘটিয়াছিল দেখা যায় এবং সকল গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগেরই মধ্যে উহা সংঘটিত হইয়াছিল। এমন কি কথা আছে যে, সেই একই সময়ে পাঁচ পাঁচ গোত্রেরই মধ্যে সহসা গৃহবিবাদ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে? গৃহবিবাদের কথা নিতান্তই অসম্ভব, তাহাও আমরা বলি না। তবে আমাদের নিকট অধিকতর সম্ভব মনে হয় যে, যাঁহারা আদিশূরের বংশধরদিগের অধিক অনুরক্ত ছিলেন, এবং যাঁহারা পূর্ব্ব নৃপতির নিকটে থাকিলে অধিকতর উন্নতির সম্ভাবনা বুঝিলেন, তাঁহারাই ভূশূরের সঙ্গে রাঢ়দেশে চলিয়া আসিয়াছিলেন। শাণ্ডিল্যগোত্রে ক্ষিতীশবংশে দামোদর ও তাঁহার সন্তানগণ এবং ভট্টনারায়ণের প্রথম স্ত্রীর পাঁচ পুত্র বরেন্দ্রে রহিলেন। কিন্তু আমাদের একটী জিজ্ঞাস্য এই যে, বারেন্দ্রকুলশাস্ত্রে দামোদরকে বরেন্দ্রভূমির শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত দেখি না কেন? আমরা দেখি যে, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র উভয় শ্রেণীরই কুলশাস্ত্রমতে ভট্টনারায়ণ বা নারায়ণভট্ট উভয় শ্রেণীরই মূল পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া উক্ত হন (২০)। প্রেমবিলাস বলেন যে, ক্ষিতীশপুত্র ভট্টনারায়ণকেই কেহ বা নারায়ণভট্ট বলিয়াও উল্লেখ করেন (২১)! ইহা হইতে আমাদের অনুমান হয় যে, ভট্টনারায়ণের পূর্ব্বে যদিও সম্ভবত তাঁহার ভ্রাতা দামোদর বরেন্দ্রে বাস করিয়া তিনি ও তাঁহার পুত্রেরা বারেন্দ্র নাম পাইয়াছিলেন, তথাপি ভট্টনারায়ণের ও তাঁহার সন্তানসন্ততির রাঢ়ে আসিবার পূর্ব্বে রাঢ়ীবারেন্দ্রভেদ প্রবল হইয়া উঠে নাই। অনুমান হয় যে, ভূশূরের সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব্বেই পুত্রেষ্টিযজ্ঞ হইতে বৎসর দশের ভিতরে আদিশূরের জীবনকালেই দামোদরের পরলোকগমন ঘটিয়াছিল, এবং তাঁহার পুত্রগণও বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ বা অন্য কোন কারণে তাঁহাদের ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন হইতে এতই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, প্রেমবিলাস গ্রন্থেও তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত হয় নাই। কাজেই ভট্টনারায়ণ হইতেই শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বারেন্দ্রব্রাহ্মণেরা নিজেদের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পরে,

(১৬) প্রে০ বি০

(১৭) প্রে০ বি০ ২৬৪।

(১৮) কু০ ত০ ১৬ ও ১৭ শ্লোক।

(১৯) স০ নি০ ২১পৃঃ।

(২০) স০ নি০ ২৯০পৃঃ।

(২১) শাণ্ডিল্যগোত্র ক্ষিতীশ পণ্ডিতপ্রধান।
তাঁর পুত্র ভট্টনারায়ণ, কেহ নারায়ণভট্ট কন॥
প্রে০ বি০ ২৪শ বিলাস।

একদিকে যখন ভট্টনারায়ণের আদিবরাহ প্রভৃতি ষোল পুত্রেরা রাঢ়ে এবং অপর দিকে তাঁহার আদি গাঁই ওঝা প্রভৃতি পুত্রেরা বরেন্দ্রদেশে পুত্রপৌত্রাদি-ক্রমে বাস করিতে লাগিলেন, তখন ক্রমে ক্রমে উভয় শ্রেণীর পার্থক্য পরিস্ফুট হইতে লাগিল। উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি বহুকাল যাবৎ প্রচলিত ছিল; কিন্তু অনুমান হয় যে, বল্লালসেনের সময়ে যখন রাঢ়ীদের ভিতরে কুলীন প্রভৃতি নানা থাকের সৃষ্টি হইল, তখন অবধি রাঢ়ীরা বারেন্দ্রদিগের সহিত ক্রিয়াকলাপে আদানপ্রদানে অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না।

এডুমিশ্র ও হরিমিশ্রের সময় পর্য্যন্ত বোধ হয়, রাঢ়ীবারেন্দ্রের ভেদ খুব পরিস্ফুট হয় নাই এবং সম্ভবত তাঁহাদের সময়ে উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল। পরে বিবাদকলহের জন্যই প্রভেদ খুব দৃঢ়রূপে দাঁড়াইয়া গেল। নুলো পঞ্চাননের সময়ে রাঢ়ীবারেন্দ্রে বিবাহে খুব প্রবল আপত্তি না থাকিলেও বিবাহ বোধ হয় দুএকটী ছাড়া বন্ধ হইয়াই গিয়াছিল (২২)। প্রেমবিলাস বলেন, রাঢীবারেন্দ্রে অনেক বিবাহ হইয়া গিয়াছে ২৩)।

এই প্রকারে আদিশূর সম্বন্ধেও অনুসন্ধান

(২২) রাঢ়ীবারেন্দ্র বিভা আর বৈদিকে বলে।
সমাজের সৃষ্টিকালে সব কার্য্য চলে॥
পৃথক অন্ন পৃথক ক্রিয় ধর্ম্ম হেতু।
ক্রমে মনের বি চ্ছ দ নষ্ট হয় ক্রতু॥
বিদ্বেষ অনল হৃদি বিদ্যুতের গতি।
ভ্রাতৃভাব পিতৃভক্তি নাশে সতীমতি॥
এডুমিশ্র হরিমিশ্র লেখে বিভাকথা।
সমাজ সংস্কারে দেখি অনেক অনাথা॥
কোটি কোটি মানবের একে যাহা করে।
তাহাকে কভু কেহ সামান্য নাহি ধরে॥
রাঢ়ী বারেন্দ্র অনৈক্য বিভা ব্যবহারে।
ছিল সমভাব পাক, যজ্ঞ ও আহারে॥
দূরদেশে থেকে ক্রমে পরিচয়ে দূর।
পরস্পর দোষে হয় বিচ্ছেদ প্রচুর॥
এমন সময়ে নাহি দেখি ঐক্যভাব।
এড়ুমিশ্র লেখেন দু—শ্রেণী মিলগান॥
কিন্তু কবে কোথা ক র কন্যাপুত্রে বিভা।
কোন্ কুলে কে করিল এপ্রকার সভা॥
নাহি আছে তার কিছুমাত্র লেখাযোখা।
থাকিলে প্রমাণগণ্য যথা স্বর্ণরেখা॥ সারাবালী
স° নি° ৫০৮পৃঃ।

(২৩) রাঢ়ী বারেন্দ্রে কিছু ভেদ নাই।
বিদ্বেষ কারণে ভেদ দেখিবারে পাই॥
রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিয়ে হৈয়াছে অনেক।
দেশভেদ নামভেদ এই পর্য্যন্তেক॥
প্রে° বি° ২১শ বিলাস।

করিতে করিতে যেমন ইতিহাস ও কুলগ্রন্থ অবলম্বনে নানা ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছি, সেইরূপ ভট্টনারায়ণ সম্বন্ধেও নানা ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া সহৃদয় পাঠকগণের সম্মুখে ধারণ করিতে সক্ষম হইলাম।

দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার গুরুজন।

(আচার্য্য শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ)

দেবেন্দ্রনাথের পিতামহী।

এই পিতামহী দ্বারকানাথ ঠাকুরের গর্ভধারিণী নহেন; কিন্তু রামলোচন ঠাকুরের পত্নী অলকাসুন্দরী। নীলমণি ঠাকুরের পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামলোচন ও মধ্যম রামমণি, দক্ষিণ ডিহি-নিবাসী রামকান্ত রায়ের দুই কন্যা অলকা ও মেনকাকে যথাক্রমে বিবাহ করেন। মেনকা দেবীর গর্ভে রামমণির রাধানাথ ও দ্বারকানাথ নামে দুই পুত্র এবং দুর্গামণি নাম্নী দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে রমানাথ নামে আর এক পুত্র হয়। রামলোচন অপুত্রক ছিলেন বলিয়া দ্বারকানাথকে পোষ্যপুত্র-রূপে গ্রহণ করেন।:

"রামলোচনের পত্নীর গর্ভে 'শিবসুন্দরী' নামে একমাত্র কন্যা হয়, কিন্তু অতি অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই কন্যার মৃত্যু হইলে রামলোচন মধ্যম ভ্রাতার পুত্র দ্বারকানাথকে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করেন। কথিত আছে, একদিন এক ভিক্ষার্থী সন্ন্যাসী রামলোচনের গৃহে উপস্থিত হয়। রামলোচনের পত্নী ভিক্ষা দিতে অগ্রসর হইলে নিকটে ক্রীড়াশীল দ্বারকানাথকে দেখাইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, 'মা এই শিশুটী অতি সুলক্ষণাক্রান্ত, ইহা দ্বারা বংশের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, ধন বৃদ্ধি হইবে, এবং মানসম্ভ্রম বাড়িবে। এ ব্যক্তি নিজেও অদ্ভুত ক্ষমতাশালী, অদ্ভুতকর্ম্মা এবং যশস্বী পুরুষ হইবে।' সন্ন্যাসীর কথায় বিচলিত হইয়া অলকা ঠাকুরাণী স্বামীকে প্রলোভিত করিয়া দেবরের নিকট হইতে দ্বারকানাথকে ১২০৫ সালে (১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে) পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। অতঃপর এই দ্বারকানাথ ব্যতীত রামলোচনের আর কোন সন্তান হয় নাই।"

১২১৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ১২ই ডিসেম্বর) রামলোচন ঠাকুরের গঙ্গালাভ হয়। রামলোচন ঠাকুর স্বীয় দত্তকপুত্র দ্বারকানাথের মঙ্গল কামনায় বিনা-বিবাদে আপন ভ্রাতৃবর্গের সহিত পৈতৃক বিষয়াদি বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু অন্নবিভাগ বা বাসবিভাগ হয় নাই।

দ্বারকানাথ ১২০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩।১৪শ

বর্ষের বালক দ্বারকানাথ পিতার মৃত্যুর পর মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (সহোদর) রাধানাথ ঠাকুরের অধীনে ছিলেন। এ সময়ে তাঁহার জন্মদাতা পিতা রামমণি ঠাকুর ও পিতৃব্য রামবল্লভ ঠাকুর জীবিত থাকিলেও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রাধানাথই তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছিলেন"। (ব. জা. ই. ব্রা. ৬।৩২০—৩২২)।

দ্বারকানাথ আজীবন মাতা অলকাসুন্দরীর প্রতি একান্ত ভক্তিমান এবং তাঁহার আজ্ঞাবহ ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের পিতামাতা।

আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ নিজের পিতামাতার কথা অধিক লিখেন নাই। মাতার বিষয়ে একবার মাত্র উল্লেখ আছে; যখন দেবেন্দ্রনাথ পিতৃশ্রাদ্ধের পূর্ব্বে মানসিক সংগ্রামে পতিত, তখন তিনি একদিন স্বর্গগতা জননীকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। সেই স্থানটী পড়িয়া আপাততঃ এরূপ ধারণা হওয়া সম্ভব যে দেবেন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সে মাতৃহীন হইয়া থাকিবেন; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। মাতার মৃত্যুকালে দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মচর্চ্চারত যুবক; তাই তিনি বিশ্বাসবলে অনুভব করিতেছিলেন যে মৃত্যুর পরেও নিশ্চয়ই মাতা জীবিতা আছেন। মাতাকে স্বপ্নদর্শন ও মাতার বিষয়ে এই সামান্য উল্লেখ হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে তাঁহার মাতার জন্য কিরূপ শ্রদ্ধামণ্ডিত স্থান ছিল। সৌদামিনী দেবী লিখিয়াছেন, (পিতৃস্মৃতি, প্রবাসী, চৈত্র ১৩১৮, ৫৬০ পৃষ্ঠা)—"পিতৃদেবের স্মরণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। একবার তাঁহার কাছে শুনিয়াছিলাম, শিশু অবস্থায় মার কোলে শুইয়া তিনি ঝিনুকে করিয়া দুধ খাইতেছেন, সে কথাও তাঁহার অল্প অল্প মনে পড়ে।" বৃহৎ পরিবারে শিশুরা একটু বড় হইলে প্রায়ই অপেক্ষাকৃত অবসরসম্পন্না পিতামহীর নিকটে প্রতিপালিত হয়। দেবেন্দ্রনাথের বেলাতেও তাহাই হইয়া থাকিবে। তাঁহার জননীর বিষয়ে আমাদের কৌতূহল অপরিতৃপ্তই থাকিয়া যাইবে।

দেবেন্দ্রনাথের পিতার সহিত সম্বন্ধ বিষয়েও আপাততঃ এই ধারণা হইতে পারে যে পিতা-পুত্রে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তাঁহার চরিতাখ্যায়ক লিখিতেছেন, "শুনিয়াছি যে দেবেন্দ্রনাথ কোন দিন তাঁহার পিতার সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতেন না। একদিন শুধু বলিয়াছিলেন যে, পিতা ইংলণ্ডে থাকিতে তাঁহার হাত-খরচের জন্য মাসিক লাখ টাকা করিয়া তাঁহাকে পাঠাইতে হইত। সুতরাং লোকে যে তাহাকে 'প্রিন্স' বলিয়া ডাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?" (অজিত ১২) "ছেলেবেলায় দেবেন্দ্রনাথ যে তাঁহার পিতার সঙ্গ খুব বেশী পাইতেন, তাহা মনে হয় না। তাঁহার সাতাত্তর বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে একদিন গল্প করিয়াছিলেন যে ছেলে বেলায় ইস্কুল হইতে আসিয়া বাবার বৈঠকখানার চারদিকে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বৈঠকখানায় ঢুকিতে ইচ্ছা হয় অথচ সাহস হয় না। একদিন তাঁহার পিতা বলিলেন—"তুই ছুটে ছুটে বেড়াস্ কেন, বৈঠকখানার ভিতরে বসতে পারিস্ না?" তবু তাঁহার ভরসা হয় না।

তার পরে এক সময়ে হঠাৎ গিয়া দেখেন যে ভিতরে বেশ ফুলের তোড়া, বৈঠকখানাটি নানা সুন্দর জিনিষ দিয়া সাজানো। তখন হইতে বৈটকখানায় বসিবার অধিকার হইল। সেইখানে বসিয়া অভিধান দেখিয়া তিনি পড়া শিখিতে লাগিলেন। এই গল্প করিয়া তিনি উমেশ বাবুকে বলিলেন, 'এখন সে বাবা নাই, আদত বাবা ছুটাছুটি ছাড়িয়া তাঁর ঘরে বসিতে বলিয়াছেন। বেশ লাগিতেছে!" (অজিত, ২৮)।

পিতার বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বিশেষ ঘনিষ্ঠতা-জ্ঞাপক নয় বটে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে সেকালে পিতায় পুত্রে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হওয়া সাধারণ রীতি ছিল না। সে কালের তুলনায় দ্বারকানাথ অতিশয় পুত্রবৎসল পিতা ছিলেন। দ্বারকানাথকে নিজ বিষয় সম্পত্তির প্রসারণে ও পরিচালনে, তৎকালীন কলিকাতার অধিকাংশ লোকহিতকর অনুষ্ঠানে এবং দেশীয় (বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী) এবং ইংরাজ ভদ্রলোকদিগের সহিত নানাবিধ সামাজিকতায়, অতিশয় ব্যস্ত থাকিতে হইত। তিনি যখন (১৮২০) গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাসভাজন হইয়া ভাবী অতুল সম্পদের ভিত্তিস্থাপনের নানা চেষ্টায় আকণ্ঠ নিমগ্ন, দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন ৩ বৎসর মাত্র; দ্বারকানাথের বিষয়-বাণিজ্যের সফলতা যখন (১৮৩৪) এত অধিক হইতে লাগিল যে তিনি গভর্ণমেণ্টের অতি উচ্চ কর্ম্মটিও ত্যাগ করা লাভজনক মনে করিলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথের বয়স ১৭ বৎসর। তখনও দেবেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্র, অথবা সবে মাত্র কলেজ ত্যাগ করিয়াছেন; সেই সময়ে পিতার ঐশ্বর্য্যের আস্বাদন লইয়া দেবেন্দ্রনাথ হঠাৎ "বিলাসের আমোদে" অত্যধিক পরিমাণে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সে জন্য তাঁহার নীতিমান পিতার অসন্তোষভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতার অপূর্ব্ব বিধানে ১৮৩৫ সালে দেবেন্দ্রনাথের চিত্তের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; পিতামহীর মৃত্যুর পর বৈরাগ্য এবং ধর্ম্মপিপাসা তাঁহার চিত্তকে একেবারে গ্রাস করিয়া

ফেলিল। দ্বারকানাথ মান সম্ভ্রম ভাল বাসিতেন, নিজ পদোচিত জাঁকজমক করিয়া বাস করিতে ভাল বাসিতেন, এবং তৎকালীন ধনীদিগের রীতি অনুসারে বিলাসের ও প্রমোদের আয়োজনও সর্ব্বদা করিতেন। কিন্তু নীতির প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার প্রদত্ত ভোজে মদ্যের স্রোত বহিয়া যাইত, কিন্তু তিনি স্বদেশে কি বিলাতে কোথাও মদ্য স্পর্শ করেন নাই। তিনি নিজ পূজা অর্চ্চনায় অতিশয় নিষ্ঠাবান ছিলেন; এমন কি, ইংলণ্ডে যখন তাঁহার ভবনে তাঁহার সাক্ষাতের জন্য কোন duchess আসিয়া অপেক্ষা করিতেন, তখনও তিনি নিজের জপ সম্পূর্ণ না করিয়া উঠিতেন না।

যখন দ্বারকানাথের সম্পদ-সূর্য্য মধ্যাহ্ন গগন উদ্ভাসিত করিয়া প্রখর কিরণে জ্বলিতেছে (১৮৪০), যখন কলিকাতার সমুদয় দেশীয় ও য়ুরোপীয় সমাজ দ্বারকানাথের ঐশ্বর্য্যে ও বদান্যতায় তাঁহার স্তুতিগানে মুখরিত ও তাঁহার অনুগ্রহ-কণা লাভের জন্য লালায়িত। যখন দ্বারকানাথ কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান দাতা, পরামর্শদাতা, ও প্রায় একচ্ছত্র সামাজিক সম্রাট্‌, সেই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের ক্ষুধিত ও তৃষিত চিত্ত একমাত্র ধর্ম্মকেই অনুসন্ধান করিতেছিল এবং পিতার ঐশ্বর্য্যে, পিতার ভবনের ও পিতার উদ্যানের বিলাসের আয়োজনে ও লোকসমারোহে অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। এই সময়ে দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথের প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেছিলেন, কিন্তু তাহার কারণ দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মভাব বা বিলাসবিমুখতা নহে, বিষয়পরিদর্শনে অমনোযোগ। এই সময়ে পিতা পুত্রে কিয়ৎ পরিমাণে মনের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইহা মনে করিলে নিতান্ত ভুল হইবে যে দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে ও চরিত্রে পিতার ছাপ নাই, বরং ইহার বিপরীত কথাই সত্য। আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় ধর্ম্মচিন্তার ও ধর্ম্মতত্ত্ব উপলব্ধির ইতিহাসকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, তাই ইহাতে পিতার বিষয় উল্লেখ এত অল্প। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের চরিত্র, শোণিতসূত্রে ও বাল্যজীবনে পিতার দৃষ্টান্তের প্রভাব সূত্রে, দ্বারকানাথের চরিত্র হইতেই স্বকীয় অধিকাংশ মহত্ত্ব ও সদ্‌গুণ আহরণ করিয়াছিল। দ্বারকানাথের চরিত্রের কর্ত্তব্যপরায়ণতা, তাঁহার একান্ত সাধুতা ও সদাশয়তা, তাঁহার উদারতা ও দানে মুক্তহস্ততা, তাঁহার ক্ষুদ্রচিত্ততায় ও ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া জীবনযাপনে একান্ত অনাস্থা, তাঁহার মনস্বিতা তেজস্বিতা ও স্বজাতির গৌরবে গর্ব্ব, তাঁহার ভারতীয় আদর্শ, সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, তাঁহার সূক্ষ্ম বিষয়ে দৃষ্টি, সৌন্দর্য্যবোধ ও শৃঙ্খলাপ্রিয়তা, এবং ধর্ম্ম-কর্ম্মে তাঁহার দৃঢ় নিষ্ঠা, আমরা দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রেও দেখিতে পাই। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ বয়স্ক হইবার পর হইতে পিতার ও পুত্রের জীবনের লক্ষ্যের ভিন্নতা অতিশয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। দ্বারকানাথের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে সংসারে প্রতিপত্তিশালী ও যশস্বী হইব, এবং প্রাণ খুলিয়া পরোপকার ও দেশের উপকার করিব। দেবেন্দ্রনাথ সংসারে নিঃস্পৃহ এবং যশ হইতে সঙ্কুচিত ছিলেন; তাঁহার মনের কথা ছিল, 'তোমা বিহনে আমার জীবনে কি কাজ?' তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে কিসে ব্রহ্মের পূজা দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হয়। দ্বারকানাথ দশের মানুষ ছিলেন, মানবপ্রেমিক ছিলেন, সর্ব্বশ্রেণীর মানুষদের লইয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মের মানুষ ছিলেন ঈশ্বরপ্রেমিক ছিলেন, ঈশ্বরপ্রেমিকদের লইয়াই থাকিতে ভাল বাসিতেন। বিষয়পরিচালনে দ্বারকানাথের বুদ্ধি এবং অনুরাগ উভয়ই প্রকাশ পাইত, দেবেন্দ্রনাথ বিষয়পরিচালনে বুদ্ধি প্রয়োগ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার অনুরাগ পড়িয়া থাকিত ঈশ্বরে। দ্বারকানাথ মানুষকে স্বদলে ও স্বমতে আনিবার এবং বিষয়সম্পদ নানা দিক দিয়া প্রসারিত করিবার কৌশলটি বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সে সকল পথ দিয়া যান নাই, সে সকল কৌশল শিখিতে পারেন নাই। অপর দিকে ধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া অবধি দেবেন্দ্রনাথ আহারে, বিহারে, আমোদে প্রমোদে ধনের ব্যবহারে এবং বন্ধু ও সহচর নির্ব্বাচনে যে কঠোর সংযমের ও শুচিতার নিয়মে আপনাকে বাঁধিয়াছিলেন, দ্বারকানাথে তাহা ছিল না। কিন্তু এই পার্থক্য সত্ত্বেও, দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতির গতিবিধির ও আচরণের অধিকাংশ লক্ষণ তাঁহাকে দ্বারকানাথের পুত্র বলিয়াই পরিচিত করিয়া দেয়।

স্বদেশের সেবায় ও বিবিধ অনুষ্ঠানে দ্বারকানাথের জীবন অতিশয় সমুজ্জ্বল। রামমোহন রায়ের ন্যায় তিনিও স্বীয় যুগের ইতিহাসে নিজের সুস্পষ্ট ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

দেবেন্দ্রনাথের পিতামহীর স্বহস্তে অনেক কার্য্য করা।

সে যুগে ধনী পরিবারের মহিলাগণও নিজের হাতে অনেক কাজ করিতেন। "রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়, এবং মোটের উপরে তখনকার জীবনযাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক বেশী সাদাসিধা ছিল। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার কালের কোন প্রাচীন লোকের কাছে গল্প করিয়াছিলেন যে, তাঁহার যখন তিন বছর বয়স তখন তিনি একটী ছোট মোড়ার উপরে দাঁড়াইয়া

ঘরের কপাটের আগল খুলিতেন, সে কথা তাঁহার বেশ মনে পড়ে। আর বেতের কুন্‌কিতে করিয়া সকালে মুড়ি-মুড়কি প্রভৃতি গ্রাম্য জলখাবার খাইতেন। অতএব দ্বারকানাথের পরিবার বিখ্যাত ধনী পরিবার হইলেও সে কালের জীবনযাত্রায় সরল ব্যবস্থাগুলি পুরুষানুক্রমে এই পরিবারে চলিয়া আসিয়াছে, ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়" (অজিত ২৫)।

"দেবেন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করিলেন, তখনও দ্বারকানাথের পৈতৃক গোলপাতার ঘর বর্ত্তমান। এই গৃহই দেবেন্দ্রনাথের সূতিকা গৃহ। মহর্ষি বলিয়াছেন যে "...'প্রথম যে দিন শাল আমার গায়ে উঠিল তাহাও আমার মনে পড়িয়াছে।' মহর্ষি অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তাহার সূচনাক্ষেত্রে জন্মিয়াছিলেন। (প্রিয়, পরি ২।৮৮)

যুগবার্ত্তা।

(কথক শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কবিরত্ন)

আর্য্যশাস্ত্রে যুগ চারটী—সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি। তাঁহাদের মতে এখন চলচে কলিযুগ। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, যেদিন শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠধামে গমন করলেন, সেদিন থেকেই কলিযুগের আরম্ভ। পুরাণ-গ্রন্থে কলিযুগের লক্ষণ যা-সব বর্ণিত হয়েছে, তা লিখে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি এবং পাঠকের ধৈর্য্য নষ্ট করতে চাইনে, বিশেষতঃ লক্ষণগুলো মোটেই শ্রুতিসুখকর নয়।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কলিযুগ কি কেবল ভারতবর্ষের জন্যই—না সমস্ত জগতের পক্ষে? পাশ্চাত্যজাতি, যাঁরা এখন সুসভ্য ও উন্নত—সে কথা তাঁরাও বলচেন এবং তাঁদের কথা শুনে, অথবা দায়ে পড়ে আমরাও বলচি—তাঁরা কিন্তু কলিযুগ মানেন না। আমাদের মতে আমরা ক্রমাবনতিতে সত্যযুগ থেকে কলিযুগে এসে পড়েছি। আর তাঁদের মতে তাঁরা Stone age থেকে ক্রমে উন্নত হতে হতে সভ্যজাতি হয়ে উঠেছে। এর কোন্‌টা সত্য? যাদের বুদ্ধিবৃত্তি কুসংস্কারে আবৃত হয়ে আছে, তাঁদের কাছে এ বিচারের কোন দরকার নাই। তাঁদের কাছে শুধু ভারতবর্ষ নিয়েই পৃথিবী, হিন্দুজাতিই একমাত্র জাতি, এবং দেবনাগর অক্ষরে লিখিত পুঁথির কথাই মাত্র অখণ্ড সত্য। কিন্তু এই কলিযুগের স্বাধীন আবহাওয়ায় অনেক সত্যানুসন্ধীর উদ্ভব হয়েছে, খুঁজে দেখা, পরখ করা এবং প্রশ্ন করাই যাদের স্বভাব। এরা কোন রকমেই যুক্তিতর্ক ছাড়বে না। এগুলোর অবাঞ্ছনীয় আয়ুষ্কালই যেন এই ভয়াবহ কলিযুগের বহরটাকে ক্রমাগত দীর্ঘ করে চলেছে।

পাশ্চাত্য কোন কোন পণ্ডিতের মতে জগৎ ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে চলেছে। আর প্রাচ্য পণ্ডিতেরা পর্য্যায়বদ্ধ উত্থানপতনযুক্ত অনন্ত অভিব্যক্তির কথা প্রচার করে' গেছেন। দ্বিতীয় মতটাই যেন বেশি যুক্তিপূর্ণ মনে হয়। ক্রমোন্নতি মানতে গেলেই একটা প্রাথমিক অনুন্নত অবস্থা মনে আসে; সঙ্গে সঙ্গে আরবাবয়বি ধারার বিশ্রামস্থানও মেনে নিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তা হ'লে সৃষ্টির অনাদিত্বযুক্তিলোপে ব্রহ্মেরও সৃষ্টির সঙ্গে নিত্যকাল বর্ত্তমানতা কষ্টকল্পিত হয়ে উঠে। সুতরাং এখানে প্রাচ্য মতটাই সত্যিকার বলে মনে হয়।

ব্যক্তি, জাতি অথবা সমাজ—সকলের উন্নতিই ভিতর হ'তে বাইরে; বাহির হ'তে ভিতরে কিছুতেই নয়। ভিতরের উন্নতিকেই আমরা বলি আধ্যাত্মিক উন্নতি। জাতীয় উন্নতি আধ্যাত্মিক উন্নতির উপরেই নির্ভর করে। আর এই উন্নতি বুঝবার মাপকাঠি এই যে, সেই উন্নত জাতি, ব্যক্তি অথবা সমাজ দ্বারা তাঁর নিজের ও জগতের হিত হ'চ্ছে কি না।

আমাদের কথা পরে বলব, আগে প্রতীচ্যের কথা বলে নিচ্ছি। পাশ্চাত্য জাতি বিজ্ঞানপ্রভাবে যতই মৃত্যুযন্ত্র আবিষ্কার করুক, বাহ্যিক সমৃদ্ধি কাম বিলাসিতার বৃদ্ধি করুক আসলে তাঁরা উন্নত হচ্ছেন না। এ কথার প্রমাণ বিগত ভয়ঙ্কর যুদ্ধের কামানের আগুণে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। অন্তর্গূঢ় কৃত্রিম সভ্যতার এমন করাল অভিব্যক্তি বিশ্ব আর কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। এই সুদীর্ঘ কালের ভিতরে তাঁদের চমক্-লাগানো সভ্যতা কোন মহত্ত্বাব প্রসব করতে পারেনি। এত দিনের ভিতরে তাঁদের মধ্যে এমন কোন মহাপুরুষ জন্মাননি, যিনি জগতে বিদ্বেষাপহারিণী শান্তিবাণী শোনাতে পারেন। সুতরাং তাঁদের মাঝেও চলেছে কলিযুগ, এটা যদি বলি, তবে তা নিতান্তই অসঙ্গত হয় কি? এইটুকু বুঝে আমাদের ভিতরে যাঁরা অন্ততঃ সাংসারিক হিসাবেও একটু বুদ্ধিমান, তাঁরা তাঁদের অবস্থার সঙ্গে ঝগড়া করলেও হিংসা করবেন না নিশ্চয়ই।

এখন বলব আমাদের কথা; পরের কথার চেয়ে কিন্তু নিজের কথাই বলা শক্ত। কারণ নিজের জিনিসের উপরে স্বভাবতই বেশি টান্ থাকে। এখানকার দু' একজন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী—যাঁদের বাসস্থান হিমাচল পর্ব্বতের কোন চিরদিনের অজানা গুহার অন্ধকারে—তাঁরা ছাড়া সবাই একথা স্বীকার করবে। সুতরাং নিজের কথা একটু হুঁসিয়ার হয়েই বলতে হবে।

দেশের কথা নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া অথবা ব্যবসা করেন, তাঁদের মধ্যে দুরকম লোক দেখ্‌তে পাই। এক দল কেবল আমাদের দোষগুলিই দেখিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত

কচ্ছেন, আর একদল কেবল অতীত-গৌরবগাথা কীর্ত্তন করে অশ্রুজল মোচন কচ্ছেন। দু-দলের কথাই কিন্তু আংশিক সত্য। ও দুটোই চাই; কারণ, দুটো মিশিয়ে দেখলেই তবে সত্যিকার দেখা হয় মনে করি। নিজের কিছু বলতে গিয়ে অনেক সময়ে নিজের চেয়েও আমরা কথাটাকেই বড় করে তুলি; এতে সত্য জিনিসটা চাপা পড়ে একটা মতবাদের সৃষ্টি হয় মাত্র।

আজ আমাদের কপালদোষে, বিকৃত শিক্ষার গুণে "স্বরাট্" "স্বাধীনতা" প্রভৃতি কথাগুলো আর এক রকম হয়ে দেখা দিচ্ছে। এদের বর্ণ এখন রক্তবর্ণ। এদের পিছনে যেন অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা আর কামানের গর্জ্জন শান্তি ও সুস্থতাকে ক্রমাগতই চোখ রাঙিয়ে শাসাচ্ছে। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের দেশে এ কথাগুলো ছিল অমৃতত্বের সোপান। অর্থাৎ যা পেলে আর অন্য কিছু পেতে ইচ্ছা হয় না; যা একবার পেলে আর যায় না, যাবার ভয় থাকে না, রাখবার জন্য উদ্বিগ্ন হতে হয় না। আর যা রাখতে গেলে কারো সঙ্গে বিরোধ হয় না। এ সম্পত্তি অপরকে বঞ্চিত করে না, বরং সমৃদ্ধ ক'রে। যে স্বাধীনতা অপরকে অধীন করে না, আমরা সেগুলোকে ভুল করে বুঝেছি বলেই এখন তাঁকে বাইরে খুঁজছি এবং তাঁর জন্যে নিজেদের তপস্যা ছেড়ে দিয়ে পরের দোরে অধম ভিখারীর মত হাত পেতে বসে আছি।

আমাদের পক্ষে এই তথাকথিত স্বাধীনতা বা স্বরাজ-নামধেয় জড়প্রকৃতির 'ছেলেভুলানো চুষিকাঠি' অথবা অমার্জ্জিত কল্পনার 'সোণার পাথরবাটীর' অভাবে আমরা একেবারে ম্রিয়মাণ হয়ে নিজেদের নেহাৎ কোণ-ঠেসা করে রেখে দিয়েছি। এতে দোষ হচ্ছে এই যে, যা পাবোনা তা কখনো পাবোনা, আর যা পেয়েছি তা প্রচুর হইলেও তাতে দারিদ্র্য এবং অভাব দূর হচ্ছে না।

এ জাতি চিরদিন বুঝে এসেছে যে, আধ্যাত্মিক লাভটাই বড় লাভ। এই জ্ঞানটাকে ভুলিয়ে দিয়ে যাঁরা বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, আমাদের কল্পিত-কাঙাল ক'রে তুলতে চাচ্ছেন, তাঁদের বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারিনে। আমরা পেয়েছি একটা জীবন্ত আধ্যাত্মিক সত্য—পাশ্চাত্য ভাষায় আজকাল বলা হচ্ছে Non-violence, আমরা বলব অহিংসা। এটা সেই সুদূর অতীত যুগের ঋষি-প্রচারিত সত্য। এর জন্মস্থান কোনো রাজধানীতে নয়—তপোবনে। কিন্তু তখনকার দিনে এর পুষ্টি হয়েছে সকল স্থানে। তখন এটা পাওয়া হয়েছিল, মাঝখানে বিকৃত শিক্ষায় আমরা একে ভুলেছিলাম। আবার তাকে নূতন করে পেয়েছি। কারণ নূতন মানুষ নূতন রকম করে' দিয়েছেন। যোগ্যাতের দান পেলে গ্রহীতা কৃতার্থ হয়। এখন এটার মূল্য যদি আমরা না বুঝি, একে যদি আদরে গৌরবে ধারণ করতে না পারি তবে যে চিরদিন দরিদ্র থাকব তা নয়, স্বধর্ম্ম-ত্যাগজনিত মহাপাপের ফলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

আমাদের ভিতরে কলিযুগ চলছে, স্বীকার করি, তবে কিনা এটা কলির শেষ ভাগ। আবার প্রকৃতির নিয়মানুসারে সত্যযুগ ফিরে আসছে। আমাদের এখন উচিত তার সঙ্গে সঙ্গত হওয়া, তাকে মেনে চলা, তার পথ সুগম করে দেওয়া। এইটুকুই মাত্র সাধনা। এর উপরে নিজেকে ছেড়ে দিতে হবে, একে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করতে হবে। এর ভিতরে একটুকু ফাঁকি থাকলেও চলবে না। মধ্যযুগে বিকৃত শিক্ষা ও অনুকরণমূলক পশু-ভাব-সঞ্জাত-শক্তির অপ-ব্যয়ের পরে প্রকৃত সত্যযুগের দ্যোতনাসূচক Non-violence তত্ত্ব পেয়েছি। এই তত্ত্বজ্ঞানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জাতির ভিতরেই সত্যযুগের সঞ্চার হবে।

আমরা চাচ্ছি "স্বরাজ"; সকলে তা এখনো পায়নি। পায়নি' তাদের নিজেদেরি দোষে। যিনি এই Non violence তত্ত্ব আমাদিগকে দিয়েছেন, তিনি কিন্তু পেয়েছেন। তাই কারাগারের লৌহপ্রাচীর তাঁকে আবদ্ধ করে না, বিরুদ্ধবাদী তাঁকে বিদ্বেষ করে না। তাই তাঁর কিছু গোপনতা নেই, তাই তাঁর বাণী—My movement is a world movement. এ স্বরাজ আমাদের তিনি দিয়েছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে আমরা তা পাইনি'। আত্মবঞ্চিত বিজ্ঞতার মোহাবর্ত্তে পড়ে আমরা কেবলি পাক খাচ্ছি। একটা জিনিস দেওয়া হ'লেই পাওয়া হয় না; নিতে জানা চাই। একে আমরা সেই দিন হ'তে কেবলি ঠেকিয়ে চলচি, যে দিন ইস্কুল-কলেজ ছাড়াকে হুজুক বলে' ভাবলুম, চরকা ঘোরানোকে বাজে কাজ বলে ধরলুম, এবং Non violence তত্ত্বটাকে অতিরিক্ত আধ্যাত্মিকতা বলে উপহাস করলুম। কেউ কেউ আজো এই Non-violence কথাটাকে এখনো একটা Diplomacy বলে ভেবে থাকেন। এই Non-violence আগে, এটাই মধ্যে এবং এটাই পরে। একমাত্র এই সাধনার পথে চলতে পারলেই আমাদের সব হবে।

অনেকেই হয় তো এই কঠোর বৈজ্ঞানিক যুগে কথাটাকে হেসে উড়িয়ে দেবেন। এঁরা বলবেন, এটা বড়ই সূক্ষ্ম রকমের আধ্যাত্মিকতত্ত্ব। কিন্তু কথা

এই যে সব রোগের চিকিৎসা এক রকম নয়। দেশ কাল পাত্রভেদে উন্নতি ও অবনতির বিভিন্নতা হয়ে থাকে। আমাদের যদি জাগ্‌তে হয় তো এরি মধ্য দিয়ে জাগ্‌ব। এ ছাড়া অন্য পন্থা নাই। আমরা মানুষ, পশুর মত ব্যবহার কর্‌লে বাঁচব কেন? আমাদের প্রকৃতিতে তা থাপ খাবে না। আমরা শক্তিমান, সুতরাং কঠিনেই আমাদের আনন্দ; আমরা ঋষির বংশধর, সুতরাং ত্যাগই আমাদের প্রকৃতি; আমাদের জন্ম ভারতবর্ষে সুতরাং ধর্ম্মই আমাদের প্রাণ; আমরা মুক্তসন্ধায়ী, সুতরাং আমাদের পন্থাও হবে নূতন সৃষ্টি; আমরা চিরকাল জগতের শিক্ষাগুরু সুতরাং আমরা যা' কর্‌ব তাই হবে আদর্শ।

ক্রমেই আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি সমস্ত জগতের পক্ষেই কলিযুগের অবসানে আধ্যাত্মিকতার উন্নতি হচ্চে। জগতে সব যায়—যেতে পারে, থাকে কেবল সত্য। Non-violence বা অহিংসা এ যুগের মহাসত্য। আমরা যেন এই মহাসত্যকে কায়মনোবাক্যে স্বীকার করে ধন্য হ'তে পারি ভারতের ভাগ্যবিধাতা আমাদের বল বিধান করুন।

ডাক্তার এডওয়ার্ড বাইল্‌স কাউয়েল।

পূর্ব্বানুবৃত্তি

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কাউয়েল সাহেব কিঞ্চিৎ পীড়িত হইয়া পড়েন এবং স্বদেশ-প্রত্যাগমনাভিলাষী হইয়া অবকাশলাভের জন্য চিকিৎসকদিগের অভিমতসম্বলিত একটী আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। ভারতবর্ষের গ্রীষ্মাতিরিক্ততা তাঁহার পক্ষে অপ্রীতিকর ছিল, বোধ হয় ইহাই তাঁহার পীড়ার একটী কারণ। তাঁহাদের স্বদেশগমনাভিলাষ বুঝিতে পারিয়া বহু অনুরক্ত ব্যক্তি দুঃখিতচিত্তে তাঁহাকে পত্রাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। পত্রলেখকদিগের মধ্যে বহু খৃষ্টধর্ম্মে নবদীক্ষিত ব্যক্তি তাঁহাকে "পিতা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইহাতেই তদানীন্তন বঙ্গীয় ছাত্রসমাজের উপর তাঁহার কিরূপ প্রভাব ছিল তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। কলিকাতায় থাকিতে থাকিতেই কাউয়েলপত্নী তদীয় পিতার অসুস্থতাসংবাদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহার স্বদেশপ্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই তিনি পরলোক গমন করেন। অনন্তর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল কলিকাতাবাসী ভারতীয় এবং ইউরোপীয় উভয়জাতীয় অনুরক্তগণকেই দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়া তাঁহারা স্বদেশযাত্রার জন্য পোতারোহণ করেন।

স্বদেশযাত্রার পূর্ব্বে কাউয়েলদম্পতী তাঁহাদের সংগৃহীত পুস্তকের বৃহত্তর অংশটী সংস্কৃতকলেজ গ্রন্থাগারকে অর্পণ করেন এবং সংস্কৃতকলেজে ব্যাকরণশিক্ষার উন্নতির জন্য মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রদানোদ্দেশ্যে কতকগুলি মুদ্রা সরকারবাহাদুরকে অর্পণ করিয়া যান। ভারত পরিত্যাগের অল্পদিন পূর্ব্বে কাউয়েল সরকারবাহাদুর কর্ত্তৃক নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীসমূহ পরিদর্শন করিয়া একটী বিবরণী প্রদান করিতে অনুরুদ্ধ হন। এই পরিদর্শন উপলক্ষে কাউয়েল সাহেবের অসাধারণ ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এতদুদ্দেশ্যে সম্মিলিত একটী সভায় নবদ্বীপের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের সহিত তাঁহার বহু কুটিল প্রশ্নের আলোচনা হয় এবং পণ্ডিতমণ্ডলী এই সুকঠিন শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হন। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি পরিদর্শনবিবরণীটী সরকারবাহাদুরকে প্রেরণ করেন এবং উহার ফলেই সরকারবাহাদুর ছাত্রদিগের বৃত্তি একশত মুদ্রা হইতে বর্দ্ধিত করিয়া সার্দ্ধশত করিয়া দেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনাবধি অবকাশের দিনগুলি সুন্দরভাবে কাটিয়া যাইতে লাগিল। ১৮৬৫ সালের গ্রীষ্মকালে কাউয়েল ভারতীয় সিবিল-সার্বিস পরীক্ষার প্রাচ্য বিষয়সমূহের একজন পরীক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীরও একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ভারতপ্রত্যাগমন ক্রমশঃ অনিশ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কাউয়েলের মাতা, ভ্রাতা ও কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু তাঁহার ভারতপ্রত্যাবর্ত্তন বিষয়ের বিশেষ বিরোধী ছিলেন, কিন্তু স্বদেশে কোন কর্ম্মপ্রাপ্তির উপরই তাঁহাদের স্বদেশাবস্থিতি নির্ভর করিতেছিল। সত্বরই একটী সুযোগ উপস্থিত হইল; ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ

একজন সংস্কৃতাধ্যাপকের পদসৃষ্টি করিতে মনঃস্থ করিলেন। কাউয়েলের পক্ষে ইহা সুবর্ণসুযোগ বলিয়া মনে হইল। অবিলম্বে মোক্ষমূলর, মনিয়র উইলিয়ামস্ প্রভৃতি বহু বিখ্যাত বিদ্বজ্জনের প্রশংসা-পত্রের সহিত তিনি একটী আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। ঐ বৎসরেরই মে মাসে কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Trinity Collegeএ তিনি উক্ত পদ লাভ করেন। তাঁহার সুন্দর অধ্যাপনাগুণে অধ্যা-পিত বিষয়ের ছাত্রসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনিও প্রতিদিন লোকপ্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহার এই লোকপ্রিয়তার একমাত্র কারণ তাঁহার আত্মাভিমানশূন্যতা ও ছাত্রগণের জন্য প্রগাঢ় পরিশ্রম।

এই সুবিপুল কর্ম্মময় জীবনের মধ্যেও কাউ-য়েলের পাঠস্পৃহা বিদূরিত হয় নাই। এই সময় তিনি বিপুল উৎসাহে হিব্রুভাষাচর্চ্চায় নিযুক্ত ছিলেন এবং তদুপরি উদ্ভিদ্‌বিদ্যালোচনা করিয়া সুবিমল আনন্দ লাভ করিতেন। প্রত্নতত্ত্বালোচনাও এই সময় তাঁহার একটী প্রিয় জিনিষ ছিল। এই সমস্ত চর্চ্চা, বিশেষতঃ উদ্ভিদ্‌বিদ্যাচর্চ্চার সুবিধার জন্য তিনি অবকাশ পাইলেই নানাদেশে পর্য্যটন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে কাউয়েল Corpus christi Collegeএর একজন সদস্য মনোনীত হইয়া Trinity College হইতে স্থানান্তরিত হন। এই সংবাদটী তাঁহার বাল্যশিক্ষক Mr. Ebdenকে জানাইলে তিনি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার এই পদপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে তদীয় বাল্যশিক্ষার স্থান Ipswich Grammar Schoolএর ছাত্রবৃন্দ অর্দ্ধদিনের অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বৎসরেরই জানুয়ারী মাসের ১১ই তারিখে তাঁহার পরম স্নেহময়ী মাতা পরলোক গমন করেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কাউয়েল এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানসূচক L.L.D. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কাউয়েল তাঁহার প্রিয় ভারতীয় শিক্ষক মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়কে কোন রাজকীয় সম্মানসূচক উপাধি প্রদানের জন্য তাঁহার পরিচিত ভারতসরকারের কোন উচ্চ কর্ম্মচারীর সহযোগিতায় বিশেষ চেষ্টা করেন। তাহারই ফলে ন্যায়রত্ন মহাশয় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে C. I. E. উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন কাউয়েল সাহেবের আবাল্য সহচর প্রিয়তম বন্ধু Edward Fitzgerald পরলোক গমন করেন। এই বন্ধুবরের সহযোগি-তায় কাউয়েলের ব্রামফোর্ডের দিনগুলি অধিকতর সুন্দর হইয়া উঠিত, ইঁহার আকস্মিক অন্তর্ধানে কাউয়েল যে বিশেষ ব্যথিত হইয়া পড়িলেন তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার এই বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ পারসিক কবি ওমর খৈয়ামের প্রথম ইংরাজী পদ্যানুবাদ রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন; পারসী প্রভৃতি অহিন্দু প্রাচ্য ভাষা চর্চ্চায় তিনি কাউয়েলের এক-জন বিশেষ সহযোগী ছিলেন। তাঁহার বিয়োগ-বেদনা কাউয়েলের অন্তরকে অবনমিত করিয়া ফেলিল।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে অপর্য্যাপ্ত কার্য্যভারপ্রপীড়িত হইয়া কাউয়েল সাহেব ভারতীয় সিবিল সার্ব্বিসের পরীক্ষক-পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে লণ্ডনমহানগরীতে "প্রাচ্য-মহাসভার" অধিবেশন হয়। কাউয়েল সাহেব এই মহাসভার "Arian Section"এর সভাপতি পদ লাভ করিয়া অত্যন্ত সফলতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এতদুপলক্ষ্যে তিনি দুইটী সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। উহার ইংরাজী অনুবাদ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। শ্লোক দুইটীর ভিতর দিয়া কাউ-য়েলের ভারতপ্রীতি বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। উহা এতদূর মর্ম্মগ্রাহী হইয়াছিল যে আমরা উহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"পুরা প্রশান্তাঃ ঋষয়ঃ সমাগমন্
বনেষু শান্তেষু—ইতি কীর্ত্তয়েৎ স্মৃতিঃ।
ভবন্ত এবং ত্বধুনা সমাগতাঃ
অদৃষ্টদোষান্নগরে সমাকুলে॥
তথাপি মন্যে রমণীয়তারসোহ-
স্ত্যাদেতি চিত্তেষু বিপর্য্যয়াদপি।
তথাহি বিদ্যুদ্‌গগনে গতপ্রভে।
তমঃসু মূর্চ্ছৎসু বিরাজতেতরাম্॥"

'পুরাকালে শান্তচিত্ত ঋষিগণ প্রশান্ত কানন-মধ্যে সমাগত হইতেন, স্মৃতি ইহাই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ; কিন্তু সম্প্রতি আপনারা অদৃষ্টদোষবশতই জনসমাকুল নগর মধ্যে সমবেত হইয়াছেন। তথাপি এবংবিধ বিপর্য্যয়ের মধ্যেও চিত্তমধ্যে রমণীয় ভাবেরই উদয় হইতেছে, কারণ দিবাশেষে গগন-মণ্ডল নিষ্প্রভ হইয়া গেলে, যখন তমোরাশি সুবিস্তৃত হইতে থাকে তখনই বিদ্যুৎ অধিকতর শোভনীয় হয়।'

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তদীয় ছাত্রবর্গ তাঁহাকে তাঁহার একটী আলোকচিত্র উপহার প্রদান করেন। পরে তাঁহার সপ্ততিবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তাঁহার একটী তৈলচিত্র কেম্ব্রিজের প্রথিতযশা চিত্রকর Mr. Brock কর্ত্তৃক অঙ্কিত হইয়া Corpus Christi College-এর সুবিপুল কক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষ্যে যে সভা আহূত হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার বহুসংখ্যক বন্ধু যোগদান করেন। তিনি এই সভায় নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটী পাঠ করেন—

"গুরুর্বিশিষ্যঃ সরলো যথা গিরৌ
অসেবিতঃ পান্থজনেন তিষ্ঠতি।
বরং স জীর্ণোহপ্যনবশিষ্যসংশ্রিতো
বৃতঃ স্বতন্ত্রৈর্বিটপৈর্বটো যথা॥"

'পর্ব্বতগাত্রজাত সরল বৃক্ষের ছায়া পথিকগণ উপভোগ করিতে পায় না—শিষ্যবিহীন গুরুও এই প্রকার। পৃথক্ পৃথক্ শাখা পরিবেষ্টিত হইয়া বটবৃক্ষ যেমন দিন দিন জীর্ণ হইতে থাকে, সেইরূপ নানা নূতন নূতন শিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়া জরাগ্রস্ত হওয়াও গুরুর পক্ষে অপেক্ষাকৃত শোভনীয়।'

পরে তাঁহার বন্ধুগণ কর্ত্তৃক এই শ্লোকটী নানা ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের যে মাসে কাউয়েল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চরম সম্মানসূচক D. C. L. উপাধি প্রাপ্ত হন। বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি উক্ত উপাধি-বিতরণ সভায় সমবেত হইয়া উঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কাউয়েল রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের ষষ্টিতম বৎসর পূর্ণ হওয়ায় উক্ত পদক প্রদান করিবার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সোসাইটীর একটী বিশেষ অধিবেশনে Lord Reary মহোদয়ের সভাপতিত্বে কাউয়েল সাহেবকে উক্ত পদকটী উপহার দেওয়া হয়।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী তারিখের একটী পত্রে জানা যায় যে, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে তাঁহার একটী তৈলচিত্র রক্ষিত হইয়াছে। তৎকালীন অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহোদয়ের যত্নেই উক্ত তৈলচিত্রটী অঙ্কিত হইয়া তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটী বিশিষ্ট সভায় উহার আবরণ উন্মোচন করা হয়।

কাউয়েলের লেখকজীবনের কোন কথা আমরা এ পর্য্যন্ত বলি নাই, কারণ দুইটী সমান্তরাল সরল-রেখার ন্যায়, উহা তাঁহার সমগ্র জীবনেতিহাসের সহিত এরূপ ভাবে প্রবহমান যে, তৎসম্বন্ধীয় একটী বিভিন্ন পুস্তক অনায়াসেই লিখিত হইতে পারে। বিভিন্ন ভাষাসম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাবলী তাঁহার তত্তৎবিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক ; ঐ প্রবন্ধসমূহের সারবত্তা, সংখ্যাতিরিক্ততা ও দীর্ঘতা চিত্তকে স্বতঃই বিস্ময়াপন্ন করিয়া তুলে। প্রবন্ধের কলেবর বর্দ্ধনাশঙ্কায় আমরা ঐ সকলের কয়েকটী মাত্র উল্লেখ করিয়া অবশিষ্টগুলি পরিহার করিতে বাধ্য হইতেছি।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কাউয়েল "Ipswich Radical Magazine and Review" নামে একটী পত্রিকা প্রকাশ করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র পঞ্চদশ বৎসর ; উহার পূর্ব্বে তাঁহার কোন লেখার পরিচয় আমরা পাই না, সুতরাং উহাকেই আমরা তাঁহার লেখকজীবনের প্রথম নিদর্শন বলিয়া মনে করি। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে "Gentleman's Magazine-এর ডিসেম্বর-সংখ্যায় তিনি "Homeric Influence in the East" নামে একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখেন। উহা তাঁহার পারসী ও গ্রীক্‌সাহিত্যে প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয়জ্ঞাপক, উহাতে তিনি মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় পুরাণ-শাস্ত্র সম্বন্ধে একটী মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন ও তাহার সমর্থনার্থ "Ælian" নামক কোন "ইউরোপীয়" লেখকের প্রবন্ধের একটী অংশ অনুবাদ করিয়া দেখাইয়াছেন। উক্ত মতবাদকে আমরা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে রাজী

না হইলেও—তদানীন্তন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদের শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেন তাহাই প্রদর্শন বাসনায় পাদটীকায় উক্ত মতবাদের কথঞ্চিৎ অংশ প্রকাশ করিলাম *।

"West Minister Review" নামক পত্রিকার ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যায় তিনি "Indian epicpoetry" নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উহা তাঁহার তাদৃশ স্বল্প বয়সে সংস্কৃত শাস্ত্রাভিজ্ঞতার বিশিষ্ট পরিচয়। "Gentleman's Magazine"এর ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের জুন-সংখ্যায় তিনি "সাবিত্রী" নামক সংস্কৃত কবিতার একটী অনুবাদ প্রকাশ করেন, এই সূত্রে মহাভারতরচয়িতা ব্যাসদেব সম্বন্ধে তিনি যে মতটী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ সাধারণের সমালোচনার্থ পাদটীকায় সন্নিবিষ্ট করিলাম। †

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের "West Minister Review" পত্রিকার জানুয়ারী সংখ্যায় কাউয়েল "Spanish literature" নামক একটী গভীর জ্ঞানপূর্ণ প্রবন্ধ বাহির করেন। উহা তাঁহার স্পেনীয় সাহিত্যে ব্যাপক ও গভীর জ্ঞানের নিদর্শন। এই প্রবন্ধটীর সম্বন্ধে একজন স্পেনীয় সাহিত্যিক বলিয়াছেন যে, "উহাতে স্পেনীয় সাহিত্যের কিছুই পরিত্যক্ত হয় নাই"। কাউয়েল কবে কিরূপে স্পেনীয় ভাষা ও সাহিত্যচর্চ্চা আরম্ভ করিয়া উহা সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা আজও অজ্ঞাত। অক্সফোর্ডে অবস্থান কালে "Oxford Essays"নামক স্বল্পায়ু পত্রটীতে তিনি "Persian Literatur" নামক একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির করেন। ইহাতে তিনি পারস্যের ইতিহাস আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, "যে জাতির একবার পতন হয়, তাহার পক্ষে পুনরুত্থান কদাচিৎ সম্ভব কিন্তু পারস্য ইহার ব্যতিক্রম, কারণ তাহার তিন বার পতন ও উত্থান ক্রমান্বয়ে ঘটিয়াছিল।" পারস্য সাহিত্যসম্বন্ধে তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেন এবং বহু কাব্যের পদ্যানুবাদও প্রকাশ করেন, বিশেষতঃ হাফেজের অনুবাদগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিল। সে সকলের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করা অসম্ভব বলিয়া আমরা তাঁহার পারস্য সাহিত্য সম্বন্ধীয় আর কোন রচনার আলোচনা করিব না। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের "Gentleman's Magazine"এর আগষ্ট-সংখ্যায় কাউয়েল "Wilson" সাহেবের ঋগ্বেদসংহিতার অনুবাদের একটী সমালোচনা প্রকাশ করেন।

"Calcutta Review" নামক পত্রিকাটী Dr Duff ও Sir John Kaye মহোদয়গণের প্রতিষ্ঠিত। কাউয়েল কলিকাতায় অবস্থান করিবার সময় ঐ পত্রের একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। তিনি উহাতে তিনটী মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ঐ সকলের মধ্যে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত "The Mythical and Legendary Accounts of Caste" নামক প্রবন্ধটী প্রগাঢ় গবেষণাপূর্ণ বলিয়া উল্লেখযোগ্য, উহা একটী জটিল বিষয়ের সুন্দর ও সুসম্বদ্ধ আলোচনা। বহু পুস্তকের সমালোচনাও উহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট ছিল।

* "On opening the Mahabharata or Shahnamah we seem to be reading an oriental edition of Homer. The simple majesty of the Greek wears indeed an oriental dress (like Themistocles at the court of Persia)" ...."The passage from Ælian which he accepts as a partial solution of the difficulty is translated" "The Indians have translated Homer into their native language, and not only they sing his poetry, but also the Kings of Persia, if one may believe the historians"

(Life of Professor Cowell Page 27)

† "The author of the Mahabharata is unknown but he may have flourished about five or six centuries before our era. Vyase the name of the reputed author merely signifies 'arrangement.'"

(Life of Professor Cowell Page 82)

ব্রহ্মসংস্পর্শ।

(শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য)

'স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বং অসৃজত।'

ব্রহ্ম ছিলেন একাকী আর একাকী থাকা ভাল লাগিল না। কিন্তু তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্, এক এবং অদ্বিতীয়; সুতরাং আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাইলেন না। শেষে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তপস্যার ফল প্রথমে শব্দ আসিল। শব্দ ব্রহ্মেরই ভিতরে লুক্কায়িত ছিল, এখন

বাহিরে আসিয়া দেখা দিল! কিন্তু সে দাঁড়ায় কোথায়? তাহার আসন কোথায়? অনন্ত শূন্যে কি পূর্ণে জানি না—অনন্ত আকাশ বিস্তৃত হইল। আকাশের বক্ষে শব্দ আসন পাতিল। আকাশ না থাকিলে শব্দ থাকিতে পারে না। আকাশের আদি ও অন্ত বুঝা যায় না—শব্দেরও আদি অন্ত অনুভূত হয় না। অনাহত শব্দে দিগন্ত কাঁপিয়া উঠিল। আকাশে শব্দ শুনিয়া—আকাশের গুণ শব্দ বুঝিয়া—ভারতের ঋষিমহর্ষিগণ আকাশ বা দ্যৌ-দেবতার স্তবস্তুতি আরম্ভ করিলেন। দ্যৌ-র বন্দনায় দ্যৌ পূর্ণ হইল। আকাশের গুণগানে আকাশ ভরিয়া গেল। আকাশ এবং শব্দ একাকার হইয়া গেল। কিন্তু কেবল আকাশে—কেবল শব্দে ব্রহ্মের মন উঠিল না—ইচ্ছা পূরিল না। শব্দ কেবলই শব্দ—তাহার ভিতরে আর কিছুই নাই। কেবল শব্দে কি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়? কেবল আকাশে কি কাহারও প্রাণ জুড়ায়? না—কখনই নহে। আরও চাই—আরও অনেক চাই। আজ যাহারা আসিয়াছে—আজ যাহাদের সম্মিলনে এই ব্রহ্মাণ্ড ফুটিয়াছে ও ফুটিতেছে—তাহাদের সকলেরই জন্য ব্রহ্মের প্রাণ কাঁদিল। তাহারা না আসিলে কিছুই হয় না—তাহারা না জাগিলে কেহই জাগে না—তাহাদের না পাইলে এই বিশাল বিশ্বলীলা জমে না। সুতরাং ব্রহ্ম অনন্ত আকাশ তলে বাঁশরী বাজাইলেন। বাঁশরী অর্থাৎ শব্দ ডাকিল—প্রেমভরে ডাকিল—আয় আয় তোরা আয়। অভিনয়ের প্রথমেই অভিনয় জমাইবার জন্য—অভিনয় মিষ্ট করিবার জন্য যেমন একতান বাদ্য না হইলে চলে না, তেমনই এই মহাবিশ্বে বিশ্বলীলা জমাইবার জন্য প্রথমেই লীলাময়ের অমৃতবর্ষী বাঁশরী অর্থাৎ শব্দ একতান বাদ্য বাজাইয়া দিল। ঐ শব্দে আকাশ কাঁপিল—দশদিক টলিল—ব্রহ্মাণ্ড দুলাইয়া বায়ু আসিয়া ব্রহ্মচরণে প্রণাম করিল। ছিল একটী, হইল দুইটী—ছিল শব্দ আসিল স্পর্শ।

এই বিশ্বের একটী আর একটীকে ডাকিতেছে; ডাকিতে ডাকিতে অপরের অঙ্গে নিজ অঙ্গ মিশাইয়া দিতেছে। কেননা, মিলন না হইলে সৃষ্টি হয় না; সংযোগ না হইলে নূতনত্বের প্রকাশ হয় না। সৃষ্টিতে অনেক নূতনত্ব চাই—অনেক নব নব বিকাশ চাই। সুতরাং শব্দ-দেবতা বায়ুর স্পর্শ দেবতাকে দর্শন মাত্রেই ছুটিয়া গিয়া তাহার অঙ্গে আপন অঙ্গ মিশাইয়া দিলেন। শব্দ ও স্পর্শ উভয়ে এক হইয়া গেলেন। শব্দের ভিতরে স্পর্শ ছিল না—কিন্তু স্পর্শের ভিতরে শব্দ ও স্পর্শ উভয়ের মিলন হইল। বায়ু মহানন্দে চারিদিকে বহিতে লাগিল। বায়ুর ভিতরে জীব শব্দ ও স্পর্শ উভয়কেই প্রাপ্ত হইল। যে দেবতা শব্দে ছিলেন, সেই দেবতাই আবার স্পর্শে দেখা দিলেন। এই যে আমাদের সর্ব্বাঙ্গে স্পর্শ খেলিয়া বেড়াইতেছে, এই যে তোমার-আমার মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত স্পর্শ রহিয়াছে, ইহা সেই স্পর্শের অতীত ব্রহ্মের স্পর্শ ভিন্ন আর কিছুই নহে! সর্ব্বাঙ্গে ব্রহ্মস্পর্শ অনুভব করিয়া শরীর যে শিহরিয়া উঠিতেছে! সর্ব্বাঙ্গে যে পুলকের লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে! আমার শরীরের সর্ব্বস্থলে ব্রহ্ম! সেই জন্যই বুঝি যোগীবর খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন—"তোমরা কি জাননা যে তোমরা প্রত্যেকে এক-একটী দেব-মন্দির!" এ কথা অসংখ্যবার সত্য যে আমরা প্রত্যেকেই এক-একটী দেবমন্দির। প্রতি জীবেই শিবের আবাসস্থল! জীবে ও শিবে একাকার; হে মানব! একবার ভাবিয়া দেখ তুমি যখন জননীজঠরে গঠিত হইতেছিলে, তখন ব্রহ্মের হস্ত তোমার এই রক্তমাংসময় শরীরকে স্পর্শ করিয়াছিল কি না? তোমার দেহে তাঁহার দেবদুর্লভ অঙ্গুলির চিহ্ন আজিও সুস্পষ্ট চিহ্নিত রহিয়াছে কি না? কে গড়িল—মাতৃগর্ভের মধ্যে তোমার আমার শরীরকে কে গড়িল?

ব্রহ্ম যেমনই তোমার-আমার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন, অমনই তোমার আমার নাসিকারন্ধ্রে প্রাণবায়ু বহিল। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান পাঁচদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। যে ছিল ঘুমাইয়া তাহাকে জাগাইল, যে ছিল জড়বৎ অচেতন তাহাকে চেতনা দিল। ব্রহ্ম নিশ্বাসে প্রশ্বাসে আমার অন্তর্ব্বাহ্য পূর্ণ করিলেন—ওতপ্রোতরূপে আমাকে ঢাকিয়া ফেলিলেন। আমি যখন কথা কহি, তখন আমি ব্রহ্মের ভিতর হইতেই কহিয়া থাকি—আমি যখন চলিয়া বেড়াই তখন আমি ব্রহ্ম-ক্রোড়েই বিচরণ করি। আমি যখন আমার নিজ অঙ্গে হাত দিই তখন সে হাত সহজেই ব্রহ্মকেই স্পর্শ করে। আমাতেই ব্রহ্ম খেলিয়া বেড়ান, আমিও ব্রহ্মের মধ্যে খেলিয়া বেড়াই।

প্রভাতের নব সূর্য্যের প্রাণপ্রদ কিরণস্পর্শে যেমন জীব জাগ্রত হইয়া উঠে, তেমনই ব্রহ্মের অমৃতময় সঞ্জীবনী স্পর্শে এই বিশ্বভুবনের সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমিও জাগিয়া উঠি। আমাদের সর্ব্বাঙ্গেই প্রাণন-ক্রিয়া চলিতেছে। পদাঙ্গুলিতে একটী ক্ষুদ্র কণ্টক বিদ্ধ হইলে অমনি সে সংবাদ আমাদের সর্ব্বাঙ্গেই ছড়াইয়া পড়ে। দেহের অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্রই প্রাণরূপে ভগবানের স্পর্শ চির বিরাজমান। প্রাণের আদর কে না করে? প্রাণরক্ষার জন্যই জগতের যাবতীয় কর্ম্মচেষ্টা চলিতেছে। সূতিকাগারে সদ্যঃপ্রসূত শিশুর প্রাণরক্ষার জন্য পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের বর্ণনাতীত ব্যস্ততা ও চিন্তার কথা

কে না জানে? শিশুর প্রাণরক্ষার জন্য পিতামাতা নিজ প্রাণকে কেমন অগ্রাহ্য করেন! শত বাধা তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে না—সহস্র বিঘ্ন তাঁহাদের কোনই বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না। সূতিকাগারে শিশুর প্রাণ প্রতি মুহূর্ত্ত বিপন্ন হইয়া থাকে—কত প্রকার আতঙ্কে আত্মীয়স্বজন দিনপাত করেন। পুরাণে দেখা যায়, মথুরার অন্ধকারময় কংস-কারাগারে বসুদেব ও দেবকীর নবজাত সন্তানের প্রাণরক্ষার জন্য কি অমানুষিক যত্ন ও সাহস প্রকাশ করা হইয়াছিল। বিঘোরা তমিস্রা রজনীর ভয়াবহ দৃশ্য, ঘন অন্ধকার-পূর্ণ আকাশের অবিরাম বজ্ররব ও বারিবর্ষণ, উন্মাদিনী কল্লোলিনী যমুনার উদ্দাম তরঙ্গভঙ্গী পিতা বসুদেবের প্রাণান্তক আগ্রহ ও উদ্যমের নিকট পরাভূত হইয়াছিল। বাস্তবিকই, মানব যদি প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণপণে ছুটে তবে সমুদ্র পথ ছাড়িয়া দেয়, পর্ব্বত সরিয়া দাঁড়ায়, ব্যাঘ্র-ভল্লুক ভয়ে পলায়ন করে। পিতামাতার এই প্রাণান্তক যত্নেই সূতিকাগারের শিশু ভয় হইতে অভয় ধামে, নিরানন্দ হইতে আনন্দালয়ে, মৃত্যু হইতে অমৃতত্বে পৌঁছিয়া থাকে। প্রিয় পুত্রের পীড়া হইলে চিকিৎসক ও ঔষধ আনিতে আমরা কি ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রাঘাতকে ভয় করি, না নদ-নদীকে গ্রাহ্য করি? প্রাণের তুল্য এ জগতে প্রিয়তম পদার্থ আর কিছুই নাই। এই প্রাণে সেই "প্রাণস্য প্রাণম্" মিশিয়া আছেন, তাই ইহা এত প্রিয়—তাই প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণপণ করি, প্রাণ উৎসর্গ করি, প্রাণের জন্য প্রাণ দিতে পারি। এই প্রাণের রক্ষাতেই সেই প্রাণবল্লভের রক্ষা, এই প্রাণের আদরেই সেই প্রাণপ্রিয় প্রাণাধারের আদর এবং এই প্রাণের পূজাতেই সেই জগৎপ্রাণের মহাপূজা হইয়া থাকে। সাবধান মানব! এই প্রাণকে তুচ্ছ করিও না—এই প্রাণকে কষ্ট দিও না—এই প্রাণকে বিনাশ করিও না।

ব্রহ্মসঙ্গীতে আছে "মধুর প্রভাতে তোমার পরশে বিশ্বভুবন জাগে।" সত্য সত্যই সৃষ্টির মধুময় প্রভাতে ব্রহ্মের স্পর্শে এই বিশ্বভুবন জাগিয়া উঠিল। এই দিগন্ত প্রসারিত অনন্ত ব্যোমে ব্রহ্মের স্পর্শে অতি ধীরে ধীরে কত শত মূরতি নড়িয়া উঠিল—এপাশ ওপাশ ফিরিয়া স্বপ্ন হইতে জাগ্রত রাজ্যে জাগিয়া উঠিল—জড়পিণ্ডের ভিতর হইতে জীবনের পথে উঠিয়া দাঁড়াইল—মহাপ্রাণের স্পর্শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অযুত প্রাণ ফুটিয়া উঠিল। রামায়ণে বর্ণিত রামচন্দ্রের পদস্পর্শে পাষাণ-খণ্ডে অহল্যার প্রকাশ কল্পিত কথা হইতে পারে, কিন্তু 'প্রাণস্য প্রাণম্' পরব্রহ্মের এক বিন্দু স্পর্শে এই জড়রাজ্য জীবন্ত প্রাণিজগতে জাগিয়া উঠিল, ইহা কল্পনা নহে—ইহা অভ্রান্ত সত্য। সত্য সত্যই ব্রহ্মস্পর্শে তরুলতা দুলিল, কুসুম হাসিল, সরিৎ ছুটিল, সিন্ধু উথলিল। এই স্পর্শে তুমি আমি জাগিলাম এবং কত জনকে জাগাইলাম। প্রভাত সমাগমে স্নেহময়ী জননী আপনি জাগিয়া ঘুমন্ত সন্তানকে জাগাইবার জন্য নাম ধরিয়া ডাকিলেন। প্রথমে শব্দ, তাই মাতা প্রথমে শব্দ উচ্চারণ করিলেন। মাতা স্নেহমাখা কণ্ঠে ডাকিলেন—"উঠ বৎস! রাত্রি প্রভাত হইয়াছে।" সন্তান ঘুমে এতই অচেতন যে, সে ডাকে সে শব্দে জাগিল না—ঘুম ভাঙ্গিল না। তখন মাতা স্পর্শের শরণ লইলেন। সুকোমল করে ধীরে ধীরে ঘুমন্ত সন্তানের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। সন্তানের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—চমকিয়া উঠিয়া বসিল। স্পর্শ নিদ্রিত জনের ঘুম ভাঙ্গিয়া দেয়—সুষুপ্তকে জাগাইয়া তুলে। স্পর্শে নিদ্রা ভাঙ্গে, প্রেম জাগে, প্রাণ অমৃতপিয়াসে অমৃতধামের দিকে যাত্রা করে। চন্দনতরুর সংস্পর্শে বনের অপর তরুও চন্দনগন্ধী হইয়া যায়। জলন্ত অগ্নির সংস্পর্শে কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার যেমন রক্তবর্ণ ধারণ করে, তেমনই সাধু ভক্তের জলন্ত তেজোময় দিব্য কান্তির স্পর্শে অঙ্গারের ন্যায় মলিন মানবের কৃষ্ণবর্ণ রূপও উজ্জ্বল-ভাব ধারণ করে। মানবের স্পর্শে মানব বাঁচিয়া যায়। তাই নিত্যানন্দের স্পর্শে মোহনিদ্রাভিভূত জগাই মাধাই-এর ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল, গৌরাঙ্গের প্রেমময় সংস্পর্শে কত বিষয়াসক্ত সংসারী জনের প্রাণে বৈরাগ্য-প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্পর্শে ঘুমন্ত ভারত বহু যুগযুগান্তের অজ্ঞান রাশি ঠেলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের নবীন আলোকে জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্পর্শে দেশে এক নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহারা না জাগাইলে দেশ আজিও জাগিত না, ইঁহারা না ডাকিলে আজিও কেহই ব্রহ্মজ্ঞানের পতাকাতলে আসিয়া দাঁড়াইত না এবং ইঁহাদের স্পর্শ না পাইলে দেশের অজ্ঞানান্ধকার আজিও ঘুচিত না। ইঁহারা দেখাইলেন তাই আমরা ব্রহ্মকে দেখিলাম, ইঁহারা গাহিলেন তাই আমরা আজ গৃহে গৃহে ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিলাম। পুরাণে কথিত ধ্রুব, তাঁহার মাতা সুনীতি দেবীকে স্পর্শ করিয়া ভগবানকে দেখাইয়াছিলেন কি না তাহা জানি না, কিন্তু উপরোক্ত মহাপুরুষগণের স্পর্শে আমরা অনেকেই অদৃশ্য ঈশ্বরকে স্পষ্ট দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

জন্মান্ধ আমরা ভগবানকে দেখিতে পাই না—এত নিকটে আছেন—দেহ মন প্রাণে আছেন—তবু বলি কৈ ভগবান কোথায়? ঋষি বলিলেন—এই যে ব্রহ্ম করতল-ন্যস্ত আমলকবৎ। আমরা কিছুই দেখিতে

পাইলাম না—বলিলাম কই, সবই ত শূন্য—সবই ত অন্ধকার! যখন কোন সিদ্ধ মহাপুরুষ আসিয়া আমাদিগকে স্পর্শ করিলেন, তখনই দেখিলাম—ঊর্দ্ধপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকম্। জ্ঞানীর সংস্পর্শ না আসিলে অজ্ঞানীর জ্ঞানোদয় হয় না—প্রেমিকের সংস্পর্শ না হইলে আমাদের পাষাণপ্রাণে প্রেমপদ্ম প্রস্ফুটিত হয় না। তোমার আমার মনের অজ্ঞানান্ধকার ঘুচাইবার জন্য, পাষাণহৃদয়ে প্রেমপদ্ম ফুটাইবার জন্য, মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গ দেখাইবার জন্য সাধু ভক্তগণ ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েন। প্রেমময় ভগবান ভক্তজনের ভিতর দিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাকে আমাকে স্পর্শ করিয়া যান। বসন্তের মলয়মারুত স্পর্শে যেমন শুষ্ক বৃক্ষলতা চমকিয়া উঠে—নব পত্র নব পুষ্পসম্ভারে নবীন সাজে সজ্জিত হয়—তেমনই প্রাণসখার পরশে শুষ্কহৃদয় নরনারী হঠাৎ শিহরিয়া উঠে—শরীর রোমাঞ্চিত হয়—পাষাণহৃদয় দ্রবীভূত হইয়া প্রেম-জলধারা চক্ষু দিয়া গড়াইয়া পড়ে। সেই অনুপম পরশমণির পরশ পাই বলিয়াই এত রোগশোকের মধ্যেও বাঁচিয়া আছি—এত দুঃখদারিদ্রের মধ্যেও হরিনাম গাহিয়া নাচিয়া বেড়াই। তোমরা কেহ কি তাঁহার স্পর্শ পাও না? তোমাদের গাত্রে মলয় মারুত কি বিফলেই বহিয়া যায়? আমি সত্য সত্যই দেখিয়া থাকি প্রাণসখার পরশে বিশ্বভুবন জাগে।

শব্দের ন্যায় স্পর্শের শক্তিও অজেয় ও অমর। পিতামাতার পবিত্র পদধূলি স্পর্শে সন্তান সকল স্থানেই আপনাকে নিরাপদ মনে করে। পতির পদরজ যে সতীর ললাটে সিন্দুরবিন্দুরূপে শোভা পায়, সে সতীকে দেখিয়া পাষণ্ড মানব ভয় পায়, যম দূরে সরিয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্মজ্ঞানী সাধুসজ্জনের পদধূলি স্পর্শে কত মানব আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। এই জন্যই পদধূলির এত মূল্য! এই জন্যই সংসারী লোকে সাধুভক্তদিগকে নিবেদন করে, "মহাশয়! আমার বাটীতে পদধূলি দিয়া কৃতার্থ করিবেন।" নিজের স্পর্শ দিয়া স্পর্শমণি যেমন কৃষ্ণবর্ণ লৌহকে সুবর্ণে পরিণত করে, তেমনই জগতের জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রচারক এবং সভ্যতার আদি গুরু আর্য্যগণ কৃষ্ণবর্ণ অসভ্য অনার্য্য পশুবৎ মানবদিগকে আপনাদের পবিত্র সংস্পর্শ দিয়া সভ্যজাতিতে উন্নীত করিয়াছেন। ভারতের আর্য্য ঋষিগণ যদি তপস্যাবলে অদৃশ্য অব্যক্ত ও অক্ষর পরব্রহ্মকে না জানিতেন এবং যদি তাঁহাদের তপঃস্বাধ্যায়ের কথা, ব্রহ্মজ্ঞানের কথা, সাধনভজনের কথা, জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা প্রাণান্তক পরিশ্রমে জগতের চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়া না বেড়াইতেন, তবে মনে হয় সমগ্র পৃথিবী আজিও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া থাকিত, মানববংশ দুর্নীতি ও বর্ব্বরতায় আজিও রাক্ষসের ন্যায়ই বিচরণ করিত, এবং ন্যায়ান্যায়, পাপ-পুণ্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মের পার্থক্য না বুঝিয়া অসভ্য নগ্নবেশে আজিও বনে বনেই ঘুরিয়া বেড়াইত। ভারতের ব্রহ্মজ্ঞানী আর্য্যগণই সমগ্র ধরণীকে পদধূলি দিয়া আজি সভ্যতার ও ধর্ম্মের জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

দিনশেষে।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল)

দিনের আলো মিলিয়ে গেল
ফুট্‌লো তারা;
দিনের মৃত্যু—তাই কি হ'বি
দুঃখে সারা?

জীবন-রবি অস্তে গেল
হ'ল আঁধা;
নতুন আলোয় জাগ্‌বে আবার,
মিথ্যে কাঁদা॥

"যুবক"এর প্রতিবাদের উত্তর।

গত অগ্রহায়ণ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আমরা রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে "যুবকের" উক্তির জন্য যে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলাম, "যুবক"এর লেখক তাহা "সমালোচনা" হিসাবে ধরিয়াছেন। আমরা কিন্তু অন্তরে বড়ই আঘাত পাইয়াই আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম, সমালোচনার হিসাবে করি নাই। প্রতিবাদ করিলেই সংকীর্ণতা প্রকাশ পায় না, কিন্তু প্রতিবাদের ভঙ্গী বা সুরেতেই তাহা প্রকাশ পায়।

বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আদিব্রাহ্মসমাজের মত খুবই উদার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথপ্রবর্ত্তিত পদ্ধতি আদর্শমাত্র। কিন্তু আদিসমাজের প্রকৃত মন্তব্য কথা এই যে, 'যে কুলের যেরূপ কৌলিক প্রথা, যে জাতির যেরূপ জাতীয় প্রথা, তাহা সেইরূপই থাকুক; কেবল সেই সকল প্রথার মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইলেই ব্রহ্মোপাসকগণের ব্রত অব্যাহত থাকিবে।' কাজেই আমরা জোরের সঙ্গে বলিতে পারি যে, পদ্ধতির বাহিরের কোন কুলপ্রথা একেশ্বরবাদের ও সুনীতির অবিরোধী হইলে তাহা অনুমোদন করিতে কোনই বাধা নাই।

প্রতিবাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—"আদিসমাজের কোন কোন মতের অনুদারতার জন্যই আচার্য্য কেশবচন্দ্র ...... বিচ্ছিন্ন হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন " এই উক্তিতেই লেখকের অদ্ভুত পক্ষপাতদুষ্টতা যে প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। লেখক যদি ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির আবেদন এবং তাহার মহর্ষিপ্রদত্ত উত্তর মনোযোগের সহিত পাঠ করেন, তবে আদিসমাজের বিরুদ্ধে ঐ "অনুদারতা" শব্দ কথনই প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। বিবাদের সেই আদিম কালে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে নানা অনুদার ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা জানা কথা, কিন্তু বিবাদের পর ন্যূনাধিক অর্দ্ধশতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে, এখন নিজেদের বৈশিষ্ট্য রাখিয়াও পরস্পরের সহিত মিলনের সময় আসিয়াছে; এখন আর পরস্পরের প্রতি অনুদার ভাব পোষণ বা অনুদার ভাষা প্রয়োগ করিবার অবসর নাই।

আমরা উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহার পর "বেদান্ততীর্থ মহাশয় আদিসমাজভুক্ত কি না," এই প্রশ্নের উত্তর অনাবশ্যক বিবেচনা করি। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে ইহা পুনরুক্ত করিতে কোনই দ্বিধা করিব না যে, বিবাহটী "উভয়বিধ" পদ্ধতি অনুসারে হয় নাই—একমাত্র আদিসমাজের পদ্ধতি অনুসারেই হইয়াছিল।

লেখক অনেক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আদিসমাজকে উপহাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাহার জন্য আমরা প্রত্যুপহাস করিতে ইচ্ছা করি না, কারণ বিবাদকলহ ইন্ধন পাইলে নির্ব্বাণ হইবার পরিবর্ত্তে বিস্তৃতিই লাভ করে। কিন্তু এই উপহাসের ভিত্তিস্বরূপে তিনি আদিসমাজের বেদীতে অব্রাহ্মণ আচার্য্য বসাইবার বিরুদ্ধে যে আদিসমাজের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার ভ্রান্ত ধারণা দূর করা কর্ত্তব্য মনে করি। লেখকের বোধ হয় ইহা জানা নাই যে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আদিসমাজ হইতে পৃথক হইবার পরও মহর্ষিদেব তাঁহার সময়ে অব্রাহ্মণ ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে বেদীতে লইয়া বসিতেন। সেইরূপ বর্ত্তমানে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথও উপবীতত্যাগী ডাক্তার শ্রীপূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং অব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে লইয়া বেদীতে বসিতে দ্বিধা করেন নাই। ইহা প্রণিধান যোগ্য যে, আদিসমাজের অন্যান্য আচার্য্যগণ সানন্দে ইহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

আমরা সদ্ভাবপ্রণোদিত হইয়া বলিতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে সাম্প্রদায়িক ভাবের অস্তিত্বের কারণে একটা "জাত-ব্রাহ্মের" উৎপত্তি হইয়াছে—তাহার ফল আমরা শুভ মনে করি না। এ বিষয়ে অনেক কথা আলোচনা করিবার আছে—বর্ত্তমানে তাহার অবসর নাই। আমরা যাহা কিছু বলিয়া আসিলাম, লেখক জানিবেন যে, তাহা বাদপ্রতিবাদের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া নহে, কিন্তু সত্যই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও তজ্জনিত সংকীর্ণতা দেখিয়া এবং তাহার ফলে ব্রাহ্মসমাজের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এইরূপ সংকীর্ণতা লক্ষ্য করিয়াই পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন—"উপবীতচিহ্নের দ্বারা সমাজে অধিকারভেদ নির্দ্দিষ্ট হয় বলিয়া যাঁহারা উপবীত ধারণকে নিন্দা করেন তাঁহারা কি এ চিন্তা করিবেন না যে অদৃশ্য উপবীত দৃশ্য উপবীতের চেয়ে অনেকগুণে দৃঢ়? "উন্নতিশীল ব্রাহ্ম" নামের পৈতাটা উচ্চ করিয়া তুলিয়া ধরিয়া * * মহাশয় যে জাত্যভিমান, যে কৌলীন্যগর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করি, তাহা কি সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারবর্জ্জিত?" (তত্ত্ব প. ১৮৩৪শক জ্যৈষ্ঠ) আমরা ইচ্ছা করি যে, আদি, সাধারণ বা নববিধান, প্রত্যেক শাখা যত ইচ্ছা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করুন, কিন্তু কেহ যেন অপরের প্রতি মনোমালিন্য পোষণ না করেন। আমাদের সকল কর্ম্মে যেন মৈত্রীই নিয়ামক হয়। আমরা এই বিষয় লইয়া বাদপ্রতিবাদ করিয়া আর পরস্পরের মধ্যে এতটুকুও বিরোধের ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার অবসর দিতে চাহি না।

গ্রন্থপরিচয়।

পুত্রের প্রতি উপদেশ।—মূল্য ৷৷০ আট আনা।

আমরা এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ পাইলাম। এত অল্প সময়ে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়াতেই ইহার উপযোগিতা বুঝা যাইতেছে। ইহা মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউসন্, বঙ্গবাসী কলেজিয়েট্ স্কুল, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী প্রভৃতি বিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হওয়ায় আমরা আনন্দিত হইলাম।

Our Spiritual Wants & their supply—এই বক্তৃতাটি পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার সভাপতির অভিভাষণরূপে প্রদত্ত হইয়াছিল। মূল্য মাত্র চারি আনা। ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সাধারণব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত।

তত্ত্বভূষণ মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের বিশেষতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অভাব ও তাহা পূরণের উপায়ের বিষয়ে নিপুণভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তত্ত্বভূষণ মহাশয় যে এ বিষয়ে ভাবিয়াছেন, তাহা এই বক্তৃতা হইতেই বুঝা যায়। কিন্তু আমরা তাঁহার ন্যায় চিন্তাশীল

প্রবীণ ব্রাহ্মের নিকট হইতে ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি।

Spirit of Brahmoism—শ্রীমুনীন্দ্রনাথ রায় এম্‌-এ বি-এল, প্রণীত। গ্রন্থটী ইংরাজীতে লেখা। গ্রন্থটী অতি সরল ভাষায় আগ্রহোদ্দীপক ভঙ্গীতে লিখিত। ইহা পাঠে ব্রাহ্মসমাজের অভিব্যক্তির ধারা বেশ বুঝা যায়। গ্রন্থটীতে কয়েকটি চিত্র আছে। কিন্তু ইহার নাম Spirit of Brahmoism না হইয়া "Evolution of Brahmoism" হইলেই বোধ হয় সঙ্গত হইত।

শোক-সংবাদ।

৺লালবিহারী বড়াল।—আদিব্রাহ্মসমাজের পরমহিতৈষী আমাদের বহুদিনের পরিচিত শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু লালবিহারী বড়াল আর নাই। তিনি বিগত ২৮এ মাঘ শুক্রবার তাঁহার হুগলী বালী-রোডস্থ ভবনে ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৭২ বৎসর হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে প্রায় ৫০ বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতম যোগ। আমাদের যতদূর মনে হয়, হুগলীর ৺ গোকুলকৃষ্ণ সিংহের সংসর্গে আসিয়া আদিব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার এবং তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপান্নালাল বড়ালের যোগের প্রথম সূচনা হয়। স্বর্গীয় আচার্য্য অঘোরাম চট্টোপাধ্যায় যখনই কাল্‌না, হুগলী, শ্রীরামপুর, ধর্ম্মপুর প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজে প্রচারার্থ যাইতেন, ঐ দুই ভ্রাতা যৌবনোচিত সুকণ্ঠ লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন এবং ঐ সকল ব্রাহ্মসমাজের উৎসবকে তাঁহাদের মধুর সঙ্গীত দ্বারা উৎসবময় করিয়া তুলিতেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চুঁচুড়ায় অবস্থান কালে ঐ দুই ভ্রাতার সহিত তাঁহার যোগ নিবিড় হইয়া উঠে। ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাদের সঙ্গীত দ্বারা মহর্ষিদেবকে প্রায়ই তৃপ্তিদান করিয়া নিজেরা ধন্য হইতেন। মহর্ষিদেব যখন বোটে করিয়া গঙ্গাবক্ষে পরিভ্রমণ করিতেন, লালবিহারী বাবু প্রায়ই তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পান্নালাল বাবুকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইতেন ও উৎসাহ সহকারে আদিব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতগুলি গাহিয়া মহর্ষিদেবকে আনন্দে আপ্লুত করিতেন। কখনও কখনও লালবিহারীবাবু আদিসমাজের অবসরপ্রাপ্ত সঙ্গীতাচার্য্য বিষ্ণুবাবুকে হালিসহর হইতে তুলিয়া লইয়া মহর্ষির নিকট উপস্থিত করিতেন ও তথায় হারমোনিয়ম ও মৃদঙ্গ সহযোগে মহর্ষিদেবের পছন্দমত একটির পর একটি ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইত। মহর্ষি এতই পুলকিত হইতেন যে প্রায়ই প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে ডাকিয়া বিষ্ণুবাবুকে পুরস্কৃত করিতেন। এই সকল সঙ্গীতসভায় ৺রাজনারায়ণ বসু, ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺ললিতমোহন সিংহ প্রভৃতি মহাত্মগণ প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন। একবার মহর্ষিদেবের ইচ্ছানুসারে ১১ই মাঘের উৎসব বোটে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ উৎসবে লালবিহারী বাবুর উপর সঙ্গীতের ভার প্রদত্ত হয়। মহর্ষি কৌতুকচ্ছলে বলিয়াছিলেন—'ইহা আমাদের অনাদি ব্রাহ্মসমাজের উৎসব।'

আদিসমাজের অন্যতম উপাচার্য্য ৺ শম্ভুনাথ গড়গড়ি মহাশয়ের সহিত লালবিহারী বাবু ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিশেষ যোগ ছিল। তাঁহাদের উভয় ভ্রাতার একান্ত আগ্রহে ও উদ্যোগে তাঁহাদের হুগলী বালীস্থ আবাস-নিকেতনে কয়েকবার ব্রহ্মোৎসব হয়। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ এবং তদীয় অগ্রজ পূজ্যপাদ ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দুই একবার ঐ উৎসবে যোগ দেন। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া লালবিহারী বাবুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়; তৎসত্ত্বেও তিনি তাঁহার হুগলীস্থ বাসভবনে 'অবৈতনিক পারমার্থিক সঙ্গীত বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করিয়া পুরাতন ব্রহ্মসঙ্গীত-চর্চ্চার বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। মাননীয় বিচারপতি স্যর আশুতোষ চৌধুরী তাঁহারই বিশেষ আহ্বানে তৎপ্রতিষ্ঠিত ঐ সঙ্গীতের কেন্দ্রস্থান হুগলীতে গিয়া জনসাধারণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া আসেন। পূজ্যপাদ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত লালবিহারী বাবুর ঘনিষ্ঠতা উত্তরকালে বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। লালবিহারীবাবু নিজ হইতে ব্যয়ভার বহন করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থের নূতন সংস্করণ বাহির করেন। পান্নালালবাবুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বাল্য হইতে জ্যেষ্ঠতাত ও পিতার নিকট হইতে ধর্ম্মভাব উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়া সঙ্গীতরচনায় ও সঙ্গীতের আলাপে অনেক দিন হইতে আদিব্রাহ্মসমাজের বিশেষভাবে সেবা করিয়া আসিতেছেন। লালবিহারীবাবুর মৃত্যুতে আমরা নিরতিশয় কাতর। পরমমাতা তাঁহার সুশীতল ক্রোড়ে তাঁহার চিরদাসকে স্থান দান করুন, ইহাই আমাদের কামনা।

চিন্তামণি বাবুর ৩য় পুত্রবধূ।—বিগত ৮ই ফাল্গুন রবিবার আদিব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ৩য় পুত্রবধূটীকে অকালে হারাইয়াছেন। চিন্তামণিবাবুর উপর শোকের আঘাত উপর্য্যুপরি চলিতেছে। পরমপিতা তাঁহার ৩য় পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের অন্তরে সান্ত্বনা বর্ষণ করুন এবং পরলোকগত আত্মাকে তাঁহার প্রসারিত ক্রোড়ে স্থানদান করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়-ব্যয়।

পৌষ ও মাঘ মাস, ১৮৪৮ শক, ১৩৩৩ সাল।

আয়	১৯৭৩/৬
পূর্ব্বকার স্থিত	২০৭/০
সমষ্টি	২১৮০০৶৬
ব্যয়	১৯০৯৶৯
স্থিত	২৭০৸৶৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

বিশেষ কার্য্যের দান	১৲
মাঘোৎসবের দান	১২৲
ঋণগ্রহণ	২৯৬৷৶০
বণ্ডেড ওয়্যারহাউস্	৬০৲
হাওলাত আদায়	৩৪৲
বিবিধ	১৷৶
সমষ্টি	৪০৫৶৬

তত্ত্ববোধিনী।

পত্রিকার বকেয়া মূল্য	২১৸০
পত্রিকার হাল মূল্য	১১৲
পত্রিকার নগদ বিক্রয়	।০
পত্রিকার মাশুল	২/০
বিজ্ঞাপনের মূল্য আদায়	২৩৲
সমষ্টি	৫৮/০

যন্ত্রালয়।

অপরের পুস্তকমুদ্রণ	৫৮৯৲
কাগজের মূল্য আদায় (অপরের)	৩০৪৷৶০
দপ্তরী, (অপরের)	৩৩৪৸/০
	১২২৮৷০

পুস্তকালয়।

সমাজের পুস্তক বিক্রয়	২৮৷/০
অপরের পুস্তক বিক্রয়	৪৲
মাশুল আদায়	১৶০
গীতারহস্যের মূল্য আদায়	২৪০৲
" মাশুল "	৭৷৶০
সমষ্টি	২৮১।/০
সর্ব্ব সমষ্টি	১৯৭৩/৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

পাথেয়	৩৲
কর্ম্মচারীগণের বেতন	১৪৩৷/০
আসবাব	৷/০
ডাকমাশুল	৭৶০
ইলেকট্রিক আলোক	১০৶৬
কেরোসিন তৈল	১৷৯
ড্রেণ পরিষ্কার করার ব্যয়	৷/০
ঋণশোধ	১১২৪৸০
হাওলাত প্রদান	৬৩৲
বারবরদারী	৯৶৬
মাঘোৎসবের ব্যয় মায় সমাজগৃহের আংশিক মেরামত	৫৮৸৶৬
কোম্পানীর কাগজ হস্তান্তর করণ জন্য	৩৫৲
বিবিধ	।৶৯
সমষ্টি	১৪৫৮।/

তত্ত্ববোধিনী।

কাগজের মূল্য প্রদান	৫৮৸৶০
পত্রিকা ডাকে পাঠাইবার মাশুল	৯৸৩
কর্ম্মচারীগণের বেতন	২২৸০
বিবিধ	২।০
সমষ্টি	৯৩।৶৩

যন্ত্রালয়।

কর্ম্মচারীগণের বেতন	১৫৬/৬
" জলপানী	৸/০
" অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	১০৶৩
মাঘোৎসবের জন্য কার্ড ও খাম খরিদ (অপরের)	১৭৸৩
প্রুফের জন্য কাগজ খরিদ	২।০
ছাপার কাগজ	৬০৷৶০
ছাপার কালি	২।০
প্রেসের জন্য তৈল	১।৩
গেলি বাঁধা দড়ি	।৶০
ডাক মাশুল	৶৬
তামাক	৸০
ক্রুস খরিদ	।৶০
লেই প্রস্তুত জন্য খরচ	।৩
বিবিধ	৯৻৩
সমষ্টি	২৬২৷৶৩

পুস্তকালয়।

বেতন	৮৸০
সমাজের পুস্তক বিক্রয়ের কমিশন	৩৸০
ডাক মাশুল	১/৬
অন্যান্য	৸/৩
গীতার মূল্য শোধ	৫৭।০
" মাশুল	৪৶০
" কমিশন	১৭৷০
" অন্যান্য	১৻৬
সমষ্টি	৯৪৷/৩
সর্ব্ব সমষ্টি	১৯০৯৶৯

একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
চৈত্র, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

১০০৪ সংখ্যা | ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি
সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৭। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩।

সার্ব্বজনীন ব্রহ্মোৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

যে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কত শত সহস্র সূর্য্য পরিভ্রমণ করিতেছে; যে ব্রহ্মাণ্ডে "যতনে জাগায়ে জ্যোতি ফিরে কোটি সূর্য্যলোক"; যেথানে ঐ অসীম আকাশস্থিত এক একটী নক্ষত্র এক একটী সূর্য্যসমান সেথানে আমাদের এই পৃথিবী কত ক্ষুদ্র! আবার যে পৃথিবীতে কত শত সাধু মহাত্মা ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া মোক্ষপথে দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছেন, সেথানে আমার ন্যায় দীন হীন মলিন বঙ্গবাসী কি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর! আমার ন্যায় এক ক্ষুদ্রশক্তি দীনহীন ব্যক্তির উপর আজিকার কার্য্যপরিচালনের গুরুভার সন্ন্যস্ত হওয়ায় আমি নিজের অক্ষমতায়, ভয়ে, লজ্জায় সত্যসত্যই ব্যথিতচিত্ত ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছি।

কিন্তু সম্মুখে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু, শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র, আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি অক্লান্তকর্ম্মা মহাপুরুষদিগের দৃষ্টান্ত পাইয়া পদে পদে স্খলিতপদ হইবার আশঙ্কা সত্বেও ভগবানের নামপ্রচারে অগ্রসর হইবার আনন্দ হইতে কে আপনাকে বঞ্চিত রাখিবে? তাঁহাদেরই দৃষ্টান্তে, তাঁহাদেরই চরণতলে দাঁড়াইয়া এই মহান ভার আমি আমার এই ক্ষুদ্র মস্তকে বহন করিতে স্বীকার করিয়াছি। যে ঈশানচন্দ্র বসুর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী আমাদের সহজলভ্য হইয়াছে, যে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অসীম অধ্যবসায়ের ফলে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী প্রদান করিয়া বৎসরের পর বৎসর শত শত যুবকের সম্মুখে এক মহান আদর্শ ধারণ করিতেছেন, সেই পরলোকগত ঈশানচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতির ন্যায় যে সকল অজ্ঞাতনামা কিন্তু নীরবকর্ম্মী মহাপুরুষ ব্রাহ্মসমাজের অক্লান্ত সেবায় নীরবে দেহপাত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরও উদ্দেশে নমস্কার করিয়া, প্রাণে নববল সঞ্চয় করিয়া, এই সভার ভিতর দিয়া সার্ব্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারভার গ্রহণ করিতে সাহস করিয়াছি। যে ভগবানের কৃপা হইলে পঙ্গু যে, সেও গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে; মূক যে, সেও বক্তা হইয়া উঠিতে পারে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সমাগত বন্ধুগণের সহায়তা ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলে সেই ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমিও এই মহাভার অক্লেশে বহন করিতে পারিব।

আজই বা এত সাধুমহাত্মাদিগের সমাগম হইল কেন? অনন্ত আকাশে প্রতিদিন যে প্রভাততপন পূর্ব্বসমুদ্রকে রঞ্জিত করিয়া উদিত হয়, আজও প্রভাতে সেই সূর্য্যই উদিত হইয়াছিল। প্রতিদিন

যে বায়ু প্রবাহিত হইয়া আমাদিগের জীবন দান করে, আজও সেই বায়ুই আমাদিগের জীবনদান করিতেছে। প্রতিদিন যে জাহ্নবী বসুন্ধরাকে শস্যশ্যামল করিয়া প্রবাহিত হয়, আজও সেই জাহ্নবীই প্রবাহিত হইতেছে। তবে আজ এই সাধুসজ্জনদিগকে এখানে নব উৎসাহে নব আনন্দে জাগ্রতভাবে আসিতে দেখি কেন? অদ্যকার দিনে কি নূতনত্ব, কি বিশেষত্ব আছে যে, তাহার বলে আকৃষ্ট হইয়া আজ আমরা এই স্থানে সমাগত হইয়াছি?

এবারকার ব্রহ্মোৎসব আমাদের মিলনোৎসবে পরিণত হইয়াছে। আমাদের পিতামাতা পরমেশ্বর আমাদের সকলকে মিলিত করিয়াছেন, এবারকার ব্রহ্মোৎসবের ইহাই বিশেষত্ব। শাখানির্বিশেষে সকল ব্রহ্মোপাসক ভগবানের চরণপূজার জন্য বিনা বাধায় বিনা দ্বিধায় একত্র মিলিত হইবেন, আমাদের এই আশা, আমাদের অনেক বৎসরের এই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আজ সাফল্য লাভের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এবারকার উৎসবে তাহার বিশেষ পরিচয় পাইয়া আমাদের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। বহুকাল যাবৎ মিলন সাধনের জন্য আমরা অনেক কথা বলিয়াছি, অনেক বক্তৃতা করিয়াছি এবং আমরা ব্যক্তিগত ভাবে অনেক চেষ্টাও করিয়াছি। কিন্তু মনে হইতেছে, এবার মিলন শুধু কথায় পর্য্যবসিত হইবে না, কার্য্যে পরিণত হইবে। মনে হইতেছে, সকল ব্রহ্মোপাসকেরই অন্তর হইতে মিলনের জন্য একটা কাতর প্রার্থনা উঠিয়াছে, এবং ভগবান যেন সেই প্রার্থনায় সাড়া দিয়াছেন। মনে হইতেছে, ভগবানের মঙ্গল বিধানে ব্রাহ্মসমাজের পুনরভ্যুদয় সমুপস্থিত।

আজ এই মিলনক্ষেত্রে ভগবানের নামে আমাদের সকলেরই হৃদয়তন্ত্রী সমভাবে ঝঙ্কার দিয়া উঠুক। উদারতম ও সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক বীজমন্ত্রের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যধর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া সকলে একপ্রাণে মিলিত হও। আজ এই নবজাগরণের দিনে সেই পরমপুরুষ ভগবানকে একমাত্র পিতামাতা জানিয়া জীবনকে ধন্য কর; এবং শুধু কথায় নয়, কাজেও মিলনের এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও—সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং—এক সঙ্গে চল, এক সঙ্গে কথা বল এবং পরস্পরের মন অবগত হও। বর্ত্তমান শুভ অবসরে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলিয়া সমস্ত বিবাদবিসম্বাদ ভুলিয়া ভগবানের প্রিয়কার্য্যসাধনে নির্ভয়ে অগ্রসর হও। বর্ত্তমান জাগরণকে আরও জাগ্রত করিয়া তোল।

আজ মনে পড়ে, আমাদের যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে যে দিন প্রথম ব্রাহ্মসম্মিলন হয়। সেই প্রথম সম্মিলনে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার কর্ত্তৃপক্ষগণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আহ্বানে সমবেত হইলেও বেদীতে একসঙ্গে বসিয়া উপাসনা করিতে সম্মত হন নাই। কিন্তু মহর্ষির প্রযত্নে ও উৎসাহে তাঁহাদের মন হইতে সে ভাব ক্রমশ বিদূরিত হইয়া গেল—তখন, পুরাকালে যেমন বিভিন্ন ঋষি একই যজ্ঞের অধ্বর্য্য, সামগান প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গের ভার গ্রহণ করিতেন, ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার আচার্য্যগণও সেইরূপ পুরাকালের মতান্তর ও মনান্তর ভুলিয়া বৎসর বৎসর ব্রাহ্মসম্মিলনের উপাসনাকার্য্যের বিভিন্ন অংশের ভার গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

আজ মনে পড়ে, যখন মহর্ষিদেব তাঁহার পার্ক-ষ্ট্রীটস্থ ভবনে ব্রাহ্মসাধারণকে সম্মিলিত উপাসনায় আহ্বান করিয়া, তিনি স্বয়ং উপাসনার মুখপত্তন করিবার জন্য উপর হইতে আমার স্কন্ধে ভর দিয়া উপাসনামণ্ডপে অবতরণ করিতেন। আজ মনে পড়ে, সেই উপাসনামণ্ডপের মধ্যস্থলে বসিয়া তিনি যখন সুগম্ভীর বেদমন্ত্রে উপাসনার সূত্রপাত করিয়া সমগ্র মণ্ডপটীকে কম্পিত করিয়া তুলিতেন; এবং সেই উপাসনায় যখন সম্মিলিত ভক্তমণ্ডলী সমস্বরে যোগদান করিতেন, তখন আমার সর্ব্বাঙ্গ কিরূপ রোমাঞ্চিত হইত।

মহর্ষিদেবের জীবিতকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন নেতাগণ এই ভাবে আনন্দহৃদয়ে প্রতি বৎসরই ব্রাহ্মসম্মিলনের অনুষ্ঠান করিতেন। মনে হয় যে, সে সময়ে বাহিরের অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলেও ব্রহ্মোপাসকদিগের অন্তরে প্রকৃত মিলন সংঘটিত হয় নাই, তাঁহাদের মন হইতে দলাদলির ভাব তখনও বিদূরিত হয় নাই। সম্ভবত সেই কারণেই মহর্ষিদেবের তিরোভাবের

পর এই সম্মিলিত উপাসনার জন্য ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আর কোনই আগ্রহ বা উদ্যোগ দেখি নাই।

অবশেষে আজ কয়েক বৎসর হইল, আমার কয়েকটী বন্ধুর আগ্রহে ও উদ্যোগে আমি মাঘোৎসব ও ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে সম্মিলিত উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া বড়ই আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম। নানা কারণে তাহাও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম—অবিচ্ছিন্নভাবে ধারাবাহিকরূপে তাহা রক্ষা করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমরা প্রাচীন ঋষিদিগের নিকটে এই সত্য আশ্বাসবাণী লাভ করিয়াছি যে, কল্যাণকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা কদাপি দুর্গতি প্রাপ্ত হন না, অর্থাৎ শুভ কর্ম্ম সুফলপ্রসূ হইবেই। এবারকার এই মিলনোৎসবে সেই আশ্বাসবাণীর সত্যতার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতেছি। সম্মিলনের সেই যে বীজ রোপিত হইয়াছিল, আজ তাহা যে সুবৃহৎ মহীরুহে পরিণত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সকল শাখাকেই, ব্রহ্মোপাসকমাত্রকেই ছায়াপ্রদানে উদ্যত হইয়াছে, ইহাতেই আমরা অত্যন্ত আশান্বিত ও আনন্দিত হইতেছি।

ব্রাহ্মসমাজের সমস্যা নির্দ্ধারণ করিয়া সকল ব্রহ্মোপাসকের মিলিতভাবে তাহার নিরাকরণ করাই আজিকার আলোচ্য বিষয়। ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা হইতেছে—ব্রাহ্মসমাজের আর প্রয়োজন আছে কি না। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলে সর্ব্বপ্রথমেই চারিদিক হইতে এই এক প্রশ্ন কানে আসিয়া উপস্থিত হয় যে, যখন চতুর্দ্দিকে শত শত ধর্ম্মসমাজ জাগিয়া উঠিয়া নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতেছে, এবং সেই সকল ধর্ম্মসমাজ যখন বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রের ভিতর দিয়া প্রকারান্তরে ব্রাহ্মসমাজেরই মঙ্গল উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন ব্রাহ্মসমাজের দাঁড়াইয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় কি না? যদি দেখা না যায়, তবে ব্রাহ্মসমাজের সমাজসমস্যা বলিয়া কোন কথাই উঠিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতই বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজের কি প্রয়োজন নাই? ইহা সত্য বটে যে, বিভিন্ন ধর্ম্মসমাজ ও বিভিন্ন কর্ম্মসংঘ ব্রাহ্মসমাজের অনেকগুলি কার্য্য গ্রহণ করিবার ফলে, ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ববর্ত্তী নেতাগণ, তাঁহাদের সমসাময়িক অন্ধকারের মধ্যে উহার প্রয়োজন স্বভাবত যেরূপ তীব্রভাবে প্রাণের ভিতর অনুভব করিয়াছিলেন, এবং অনুভব করিয়া যে বলের সহিত তাহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আমাদের অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন তত তীব্ররূপে অনুভব করিবার অবকাশই পাই না; কাজেকাজেই ব্রাহ্মসমাজের মূল পত্তনভূমি উদারতম অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের কথা সেই পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যদিগের ন্যায় উপযুক্ত বলের সহিত প্রচার করিতেও উদ্যুক্ত হই না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য কি সত্যই সর্ব্বতোভাবে সংসিদ্ধ হইয়াছে? যতদিন মানুষ সীমাবদ্ধ থাকিবে, এবং যতদিন মানুষ সাম্প্রদায়িকতার হাত সম্পূর্ণ এড়াইতে পারিবে না, যতদিন মানুষ ক্ষুদ্রতা লইয়া খেলা করিবে, ততদিন ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সংসিদ্ধ হইতে পারিবে না, এবং ততদিন ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন অস্বীকৃত হইতে পারিবে না, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারও ব্যর্থ বলা যাইতে পারিবে না। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম অবধি যে গৃহবিবাদ ও অন্তর্বিরোধের বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সমগ্র ভারতভূমিকে স্বীয় করালগ্রাসে কবলিত করিবার উদ্যোগ করিয়াছে, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের যে বিষবীজ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে, সেই গৃহবিবাদ, সেই অন্তর্বিরোধ, সেই অধর্ম্মের বিস্তারই আজ আমাদিগকে সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছে যে, ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় উদারতম বীজমন্ত্রের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। এখনও পল্লীগ্রামে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে যে বিষময় ভাব শিক্ষিতদের হৃদয় অধিকার করিয়া আছে, তাহাই ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন সবলে সপ্রমাণ করে।

মিলনমন্ত্র সাধনের জন্য, শান্তি সংস্থাপনের জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য, জাতীয় কল্যাণের জন্য ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় উদারতম একটী সমাজের দীপ্ত দীপ সমুজ্জ্বল রাখা আবশ্যক। শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, গুরুবাদের সহিত, সম্প্রদায়ের চরণে সম্পূর্ণ পরাধীনতার সহিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দ্বন্দ্ব, শতবিধ দুর্নীতি অনাচার ও কদাচারের সহিত অন্তরের সদ্ভাবের দ্বন্দ্ব যখন দেশকে ছিন্নভিন্ন করিয়া তুলিতেছিল, সেই সময়ে ভগবৎপ্রেরিত সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্ম-

সমাজেরই ভিতর দিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিল। আবার এই যে হিন্দুমুসলমানের ভীষণ দ্বন্দ্ব আমাদের শান্তিময় দেশে চতুর্দ্দিকে অশান্তির উৎস খুলিয়া দিয়াছে, আমার বিশ্বাস, সাম্প্রদায়িকতার হাত হইতে মুক্তিলাভ না করিলে, যে নামেই অভিহিত কর না কেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িক সত্য অন্তরে গ্রহণ না করিলে, এবং তাহা বলের সহিত কথায় ও কার্য্যে প্রচার করিতে না পারিলে এই দ্বন্দ্বের বীজ মরিবে না, চিরন্তন শান্তি সংস্থাপিত হইবে না, দেশে কল্যাণ সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না।

চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, সমগ্র ভারতে আজ এক মহা নবজাগরণের যুগ নামিয়া আসিয়াছে। ধীরভাবে আলোচনা করিলে দেখিবে যে, এই নবজাগরণের সূত্রপাত হয় ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপন হইতে। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের আকারে যে জাগরণের বীজ এই ভারতভূমিতে রোপণ করিয়াছিলেন, কে অস্বীকার করিবে যে, আজ সেই বীজ প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়া কেবল ভারতকে নহে, সমগ্র জগতকে আশ্রয় দিতে চলিয়াছে। রামমোহন রায় সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার যে এক আশ্চর্য্য ভাবতরঙ্গ চালাইয়া দিয়াছিলেন, আজ সেই তরঙ্গের জগদ্ব্যাপী প্রসার দেখিয়া কাহার হৃদয় না আনন্দিত হয়! ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাবের কারণেই ভারতবাসী নিজের হারানিধি মনুষ্যত্বকে খুঁজিয়া পাইয়াছে, এবং সেই মনুষ্যত্বের উপর দাঁড়াইয়াই ভারতবাসী আজ জগতের মহাসভায় নিজের আসন সুদৃঢ় করিবার জন্য ন্যায্য দাবী করিতে সক্ষম হইতেছে। এই মনুষ্যত্বকে খুঁজিয়া পাইবার ফলেই আজ বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানবিষয়ক নবতর সত্য আবিষ্কারে অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন। এই মনুষ্যত্বকে খুঁজিয়া পাইবার ফলেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র হইতে স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার শিষ্যগণ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে মুক্তির নবতর বার্ত্তা ঘোষণা করিতে সাহস করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের আবিষ্কৃত মনুষ্যত্বের স্বাধীনতাবায়ুতে পরিপুষ্ট বলিয়াই পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতাঞ্জলির চরণে সমগ্র ভূখণ্ডের মস্তক অবনমিত করিতে পারিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় সেই যে জাগরণের নবযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, আজ শতাব্দী পরে সেই নবযুগের সন্ধিক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে; এখন সন্ধিক্ষণের অরুণ আভার পরিবর্ত্তে নবজাগরণের নবোজ্জ্বল সূর্য্য আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে। ক্ষণজন্মা রামমোহন রায় সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির যে ক্ষীণধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন, আজ তাহাতে জোয়ার আসিয়াছে। কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই জোয়ার প্রতিরুদ্ধ করে।

সত্যধর্ম্মই হইল ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি, সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতাই হইল ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ এবং সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিই হইল ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য। যে ব্রাহ্মসমাজ হইতে এই সত্যধর্ম্মের বাণী আজ আমাদের গৃহে গৃহে প্রচারিত হইতেছে; যে ব্রাহ্মসমাজ হইতে আমরা সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সুমঙ্গল বার্ত্তা কর্ণে জপমন্ত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই ব্রাহ্মসমাজকে না বাঁচাইয়া রাখিলে আমাদের আশ্রয়স্থল কোথায়? আর, যদি সেই ব্রাহ্মসমাজকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাও, তবে হিংসা দ্বন্দ্ব ভুলিয়া গিয়া, ছোটখাটো মান অভিমান ভুলিয়া গিয়া, উচ্চনীচ ক্ষুদ্রবৃহতের ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়া পরস্পর মিলিত হও। সকল ভাইকে প্রেমের কঠিনকোমল বন্ধনে বাঁধিবার জন্য অগ্রসর হও। সংশয়াত্মা সংসারী লোকের কথায় বিচলিত হইও না। আমাদের যিনি একই পিতামাতা, তিনি আমাদের প্রত্যেকের আত্মাতে সমাসীন থাকিয়া আমাদিগকে ক্রমাগত বলিতেছেন—পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিও না—মিলিত হও। ঐ অনন্ত আকাশ হইতে সেই মঙ্গলবাণীরই প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে ক্রমাগত বলিতেছে—মিলিত হও—মিলিত হও।

সত্যই এখন আমরা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবি যে, এতদিন আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলাম—কেন? আমাদের পরস্পরের মধ্যে—প্রভেদ—কোথায়? ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার মধ্যে—প্রকৃতই কোন ধর্ম্মসমাজের সঙ্গে মূলগত কোনই প্রভেদ আমি তো দেখিতে পাই না। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই যে বীজ—তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব

সমাজের লক্ষ্য সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে আমাদের দৃষ্টি সরিয়া গিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রতি যদি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিত, তবে, উপস্থিত অনেকের অপ্রিয়ভাজন হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও, আমার এই হৃদয়ের কথা বলিতেছি যে, দেশের এই দুঃখদুর্দ্দিনের দিনে, ইতিহাস প্রতি পৃষ্ঠায় যে নৃত্যগীতকে অবনতির পিচ্ছিল পথ বলিয়া সপ্রমাণ করিতেছে ; জাপান, ইটালি প্রভৃতি দেশ যাহার অপকারিতা উপলব্ধি করিয়া যাহাকে নির্ব্বাসিত করিবার চেষ্টায় আছে, সেই নৃত্যগীতকে উৎসাহদান করিয়া মাতৃজাতিকে অবমাননা করিতে অগ্রসর হইতাম না। আমি কেন, কেহই নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদের বিরোধী হইতে পারে না। কিন্তু যে সকল আমোদ প্রমোদ মানবের নীচভাবসকল, স্বীকার করি বা নাই করি, উত্তেজিত করিতে বাধ্য, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই সেই সকল আমোদপ্রমোদের সম্পূর্ণ বিরোধী হইবেন নিঃসন্দেহ। এই যে অভিনয়শালায় অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়, অভিনয়শালার কোন্ কর্ত্তৃপক্ষ অস্বীকার করিতে পারেন যে, জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য অনেক স্থলেই তাঁহাদিগকে নানা অসঙ্গত উপায় অবলম্বন করিতে হয় ? কে জানে যে, বর্ত্তমানে ছাত্রদিগের মধ্যে শত করা ৭০ জন যে ভীষণ রোগের স্পর্শাক্রান্ত, অভিনয়শালার অভিনয়দর্শন প্রভৃতি অন্যায় কার্য্য তাহার কারণ নয় ?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আমাদের এক পারিবারিক উপাসনায় এই একটী জাগরণমন্ত্র দিয়াছিলেন—ব্রহ্মোপাসকগণ সমস্ত জাতি অপেক্ষা সকল বিষয়ে, কি জ্ঞানে কি বিদ্যায় কি ধর্ম্মে কি অর্থে উন্নত না হইলে ব্রাহ্মসমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী। বিগত মহাসমরের পর ইউরোপের ইতিহাস হইতে আমরা এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, ব্রাহ্মসমাজের পতন হইলে তাহার আবর্ত্তে ভারতের সকল সমাজই ডুবিতে থাকিবে। বর্ত্তমান যুগে দেশের যেরূপ অবস্থা আসিয়াছে, তাহাতে দেশবাসীর কর্ণে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঐ জাগরণমন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন মন্ত্র দিতে পারি না।

ব্রাহ্মসমাজকে যদি আবার জাগাইয়া তুলিতে চাই, হিন্দুসমাজকে যদি আবার ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইতে চাই, সমগ্র ভারতবাসীকে যদি আবার সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ও উন্নতির সমুচ্চ শিখরে দাঁড় করাইতে চাই, তবে প্রত্যেক ভারতবাসীকে, প্রত্যেক হিন্দুকে, প্রত্যেক ব্রহ্মোপাসককে নির্ভয়ে সর্ব্ববিধ অন্যায় সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে ; সংসারের সকল ক্ষেত্রে, জীবনযাত্রার সকল বিভাগে সেই অপরাজিত দেবতার বিজয় ঘোষণা করিতে হইবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সত্যধর্ম্মের যে বীজমন্ত্র আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহাই কৌস্তুভমণির ন্যায় আমাদিগের অন্তরে ধারণ করিতে হইবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যে জাগরণমন্ত্র আজ উপস্থিত করিলাম, তাহাই জপমন্ত্ররূপে সঙ্গে সঙ্গে রাখিতে হইবে এবং মৈত্রীকে ব্যবহারের নিয়ামক করিতে হইবে। কেবল ব্রাহ্মসমাজ কেন, যে সমাজ এই ভাবে চলিতে থাকিবে, সেই সমাজেরই সমস্যাসকল সহজেই নিরাকৃত হইতে পারিবে।

ব্রহ্মোপাসক বন্ধুগণ ! এই পথে নির্ভয়ে অগ্রসর হও। কথায় ও কার্য্যে সত্যধর্ম্ম প্রচারের যে শুভ অবসর আসিয়াছে, এই শুভ অবসরে তোমাদের নিদ্রিত থাকিলে চলিবে না। ভগবানের মাভৈ-বাণী আকাশের প্রত্যেক অংশ হইতে প্রতিমুহূর্ত্তে ধ্বনিত হইতেছে। এই জাগরণের মুখে, আমোদপ্রমোদের মোহে, ঘুমের ঘোরে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলে আমাদের মৃত্যুকেই বরণ করিতে হইবে। যতদিন এই ভারতভূমি পুরাকালের ন্যায় জগতের মহাসভায় উপযুক্ত উচ্চ আসন অধিকার না করে, যতদিন না সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দেশবাসীর হস্তগত হয়, ততদিন আমার এই কাতর মিনতি, বৃথা হাসি খেলা, অশ্লীল আমোদপ্রমোদের কথা মুখেও আনিও না ; ভায়ে-ভায়ে বৃথা দ্বন্দ্ববিবাদ করিয়া নিজের শক্তির, দেশের শক্তির অপচয় হইতে দিও না। পদতলে দলিত করিয়া দাও নৃত্যগীতের কথা ; দূর করিয়া দাও ভেদাভেদের কথা।

বিশ্ববিধাতা মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গলভাবে, তাঁহার অমিত শক্তিতে যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে ; সেই আনন্দস্বরূপের আনন্দবিধানে যদি আমাদের প্রকৃত আস্থা থাকে, তবে আমরা স্পষ্ট বুঝিব যে, এখানে দুর্ব্বলতার স্থান নাই। দুর্ব্বলতাই ভয়ের

কারণ। দুর্ব্বল যে, সেই সংশয় করিতে পারে যে, সম্মুখে প্রতি পদনিক্ষেপের ফলে প্রাচীন জীর্ণ, কিন্তু চিরপরিচিত, সমাজ যদি ভূমিসাৎ হয়, তবে কি হইবে? যথার্থ প্রাণের সহিত ভগবানের মঙ্গলবিধান উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সত্যধর্ম্ম প্রচার করা, কথায় ও কার্য্যে একমিল হইয়া সকল শুভকর্ম্মে অগ্রসর হওয়া দুর্ব্বল ভীরু সংশয়াত্মার কর্ম্ম নয়। যথার্থ প্রাণের সহিত শুভকার্য্যসাধনে অগ্রণী হওয়া স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতাদৃপ্ত, ধর্ম্মের নামে অনাচারনিরত উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত মানবের কার্য্য নয়। তাহার বিকৃতদৃষ্টি দেখিতে পায় না যে, সকল ঘটনার ভিতর দিয়া মঙ্গলবিধাতা ভগবানের মঙ্গলহস্ত কি এক আশ্চর্য্য মঙ্গলসৌধ গড়িয়া তুলিতেছে। ভগবানের পথে অগ্রসর হইতে গেলে সৎসাহস চাই, ধৈর্য্য চাই, সহিষ্ণুতা চাই, একনিষ্ঠা চাই।

নিশ্চয় জানিও, সকল স্বাধীনতার উৎস, সকল মঙ্গলের একমাত্র নিদান সেই স্বাধীন অমৃতপুরুষের সন্তান তুমি—তুমিও বীর, তুমিও সবল। সেই অমৃত পুরুষের অনিমেষ মঙ্গল দৃষ্টিতে স্বীয় দৃষ্টি সম্বদ্ধ করিয়া, মানুষের ভালমন্দ বলার উপর, মানুষের নিন্দাপ্রশংসার উপর কিছুমাত্র নির্ভর করিও না, ভ্রূক্ষেপ করিও না। প্রতি নিমেষে অন্তরে কাণ পাতিয়া শোন যে, অন্তরের গুরু তোমাকে কোন্ পথে যাইতে আদেশ করেন। সেই আদেশ শুনিয়া সত্যধর্ম্মের পথে অগ্রসর হও —মানুষের ভয়ে, সংসারের প্রলোভনে সেই পথ হইতে বিচ্যুত হইও না। তোমাদের সকল সমস্যা সহজেই মীমাংসিত হইবে।

অধর্ম্মের সহিত সংগ্রামে যদি জয়লাভ করিতে চাও, সন্তানসন্ততির যদি প্রকৃত উন্নতি দেখিবার আশা কর, তবে অসত্য, অধর্ম্ম হইতে নিজেরাও সর্ব্বদা দূরে থাকিবে এবং সন্তানগণকেও সর্ব্বদা দূরে রাখিবে। জ্ঞানে বড় হও, ধর্ম্মে বড় হও, কর্ম্মে বড় হও। ভগবানের হস্তে ফলাফলের ভার সমর্পণ করিয়া নিজের মঙ্গলসাধনে, সমাজের ও দেশের কল্যাণসাধনে একমনে একপ্রাণে আপনাকে নিয়োগ কর। দ্বেষহিংসা বিদূরিত করিয়া পরস্পরকে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা কর। স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে, ব্রাহ্মণপঞ্চম-নির্ব্বিশেষে সকলের সম্মুখে জ্ঞানলাভের দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া দাও। তখন দেখিবে, স্বরাজ হস্তগত হইয়াছে, স্বাধীনতা হস্তগত হইয়াছে, উন্নতির সুবিস্তৃত রাজপথ উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। তখন ভগবানের অমোঘ আশীর্ব্বাদ দেশের মস্তকে ঝরিতে থাকিবে; দেশ সজীব হইয়া উঠিবে, এবং শ্রদ্ধা-ভক্তি-জ্ঞান কর্ম্মের সাহায্যে সকল সদ্‌গুণের আধার হইয়া উঠিবে; সমগ্র দেশে দুঃখ-দৈন্যের হাহাকার ও ক্রন্দনের পরিবর্ত্তে আনন্দের বিমল হাসি ও শুভ অনুষ্ঠানসমূহের মঙ্গলশঙ্খ আবার বাজিয়া উঠিবে। তখন তোমার হৃদয় হইতে ভগবানের নামে নিত্য এই জয়ধ্বনি উঠিতে থাকিবে—জয় ভগবানের জয়।

এমিয়েলের জার্নাল।

(শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়)

জিনেভা,

২৫শে আগষ্ট, ১৮৭১।

দিবসটি কি প্রসন্ন, আকাশটি কি অপূর্ব্ব, বাতাসটি কি স্নিগ্ধ! প্রভাতকালটি যেন অগাধ শান্তিসাগরজলে সুস্নাত ও পরিতৃপ্ত! পর্ব্বতে সৈকতে নন্দন-সৌরভ বিরাজিত! এ সমুদয়ই যেন আমাদের প্রতি অজস্র আশীর্ব্বাদ। এই ধ্যানরত স্থলের পুণ্য গাম্ভীর্য্যকে ভঙ্গ করিতে কোন প্রকার তুচ্ছ অবান্তর কোলাহল নাই। মনে হয় যেন কোন এক বিশাল মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশলাভ করিয়াছি। ইহার মধ্যে প্রত্যেক প্রাকৃতিক জীব ও সৌন্দর্য্যের প্রবেশাধিকার ও নির্দ্দিষ্ট স্থান বর্ত্তমান। এই বিরাট দেবদূতগণের সঙ্গমস্নিগ্ধ শান্তিস্বপ্ন ভঙ্গের আশঙ্কায় আমি এমন কি নিশ্বাসপাতেও ক্ষান্ত আছি। এই সকল স্বর্গীয় শুভ মুহূর্ত্তেই আমাদের ওষ্ঠপ্রান্তে উচ্চারিত হয়—আমি উপলব্ধি করি, আমি বিশ্বাস করি, আমি দর্শন করি; এবং তখনই সমস্ত দুঃখ-ব্যথা ও দুর্দ্দশা, জীবনের অসহনীয় জ্বালা যন্ত্রণা বিস্মৃতিসলিলে বিসর্জ্জনান্তে স্বর্গীয় ভূমানন্দে নিমগ্ন হই। আমরা দেবগণের শ্রেণীভুক্ত হই, এবং ঈশ্বরপ্রসাদের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া ধন্য হই। কর্ম্ম-ক্লেশ, অশ্রুপাত, দুঃখ, পাপ, মৃত্যু সকলই অন্তর্হিত হয়। পার্থিব জীবন ধন্য হইয়া অবিমিশ্র আনন্দে পরিণত হয়। পদার্থসমূহের এই সুগম্ভীর নীরব নিশ্চলতার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার স্বরবৈষম্য বিলীন হয়। প্রতীত হয় যেন সৃষ্টিবৈচিত্র্য এক সুবৃহৎ ঐক্যতান—প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বরের গুণকীর্ত্তনে সর্ব্বক্ষণ রত। সৃষ্টির কার্য্য ইহা ব্যতীত অন্য কিছু কিনা সে প্রশ্ন আমাদের চিন্তায় তখন আর

—ভগবানকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার একমাত্র উপাসনা—এই বীজমন্ত্র কোন্ ব্রহ্মোপাসক অস্বীকার করিবেন ? যে বীজমন্ত্র এতই অসাম্প্রদায়িক ও উদার যে, জগতের কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ই তাহাকে অস্বীকার করিলে দাঁড়াইতেই পারে না, সেই বীজমন্ত্রকে ব্রাহ্মসমাজের কোন শাখাই যে অস্বীকার করিতে পারেন না এবং করেন না, তাহা বলাই বাহুল্য। এই উদারতম ও সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক বীজমন্ত্র যখন প্রত্যেক ব্রহ্মোপাসকেরই অবলম্বনীয়, তখন তাঁহাদের মধ্যে অবান্তর বিষয়ে শত মতভেদ থাকিলেও বিবাদ বা মনোমালিন্য আসিবার কোনই অবকাশ নাই। আমাদের বুঝিতে হইবে যে, আমরা সত্যই একই পিতামাতার চরণপূজার জন্য ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছি। আমাদের উপাস্য দেবতা সত্যং—জ্ঞানং—অনন্তং ব্রহ্ম; আমাদের উপাস্য দেবতা বিগতবিবাদং পরমেশ্বর। ভগবান অনন্তস্বরূপ। তাঁহার অনন্তভাবের এক একটী কণা এক একটী নরনারীর অন্তরে বৈশিষ্ট্য লাভের চেষ্টা করিতেছে। এই কারণেই সংসারে এত বৈচিত্র্য। ইহা বুঝিয়া প্রত্যেক ব্রহ্মোপাসকের কর্ত্তব্য—পরস্পরের মতপার্থক্যের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক সত্যধর্ম্মের মূলবীজে একমত হইয়া প্রাণের অন্তরে সদ্ভাবে মিলিত হওয়া, পরস্পরের উন্নতিতে সুখী হওয়া, পরস্পরের অবনতিতে দুঃখিত হওয়া। এইভাবে ব্রহ্মোপাসকগণ একহৃদয় হইয়া ভগবানের নামপ্রচারে বহির্গত হইলে দিগ্বিজয়ীর বেশে ফিরিতে পারিবেন নিঃসন্দেহ, এই ভাবে পরস্পর যথার্থ মিলিত হইয়া সত্যধর্ম্ম প্রচারে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে কাহার সাধ্য ?

মিলনের যে কি ফল, তাহা আমরা এবারকার ব্রহ্মোৎসবে প্রত্যক্ষ করিলাম। পণ্ডিতেরা ঠিকই বলিয়াছেন যে, যে খড়বিচালি এক একটী ধরিলে বিশেষ কোনই কার্য্যে আসিবে না, তাহারই সমষ্টি দ্বারা বলবান হস্তীকেও বাঁধা যায়, কারণ—সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা—মিলনেই কার্য্যের সাফল্য। ইংরাজদের নিকট তাহাদেরও সাফল্যের গুপ্তমন্ত্র লাভ করিয়াছি—Union is strength। এই মিলন শুধু কথায় পর্য্যবসিত হইলে চলিবে না—আন্তরিক হওয়া চাই—কথায় ও কার্য্যে এক হওয়া চাই। যে সমাজ মুখের কথা কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিবে, সে সমাজকে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেই হইবে। শুধু ব্রাহ্মসমাজ কেন, কোন সমাজই—ধর্ম্মসমাজই বল, গার্হস্থ্যসমাজই বল, আর রাজনৈতিক সমাজই বল—কেবল মুখের কথায় উন্নতির পথে জীবনের পথে স্থির থাকিতে পারে না। "শুধু কথায় কিছু হইবে না, কাজ চাই"—এই সত্যবাণী আজ কিছুকাল যাবৎ ভারতবাসী জনসাধারণের অন্তরে বড়ই বেশীরকম আলোড়িত হইতেছিল এবং বাহিরে তাহা ব্যক্ত হইতে চাহিতেছিল। তাই না সেদিন রাষ্ট্রীয় মহাসভায় সভাপতির মুখে ভগবৎপ্রেরণায় এই বাণী ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল যে, এখন আর আমাদের "কথায় কাজ নাই, কাজের কথা চাই" অর্থাৎ আমাদের কথা ও কাজের মধ্যে মিল চাই—কথায় যে সত্য প্রচার করিব, কার্য্যেও তাহাই পরিণত করিব। কেবল রাজনীতিক্ষেত্রে নহে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই মন্ত্র ভারতবাসী সকল ব্যক্তির, সকল সমাজের সকল অবস্থারই হৃদয়ের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজনীতিক্ষেত্রে যদি এই মন্ত্র, কেবল হৃদয়ে ধারণ নহে, কার্য্যেও পরিণত করিতাম, তবে দেশের অনেক রাজনৈতিক সমস্যার খুব সহজেই সমাধান হইত। এই মন্ত্র দেশবাসীর হৃদয়ের অনেকটা স্থান সুদৃঢ়রূপে অধিকার করিয়াছে বলিয়াই আজ কঠোর রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসমাজও নির্য্যাতিত রমণীকে সমাজে পুনর্গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজের আশীর্ব্বাদ সঞ্চয়ে অগ্রসর হইতে সাহস করিয়াছেন। মুখে এক সত্য প্রচার করিব, তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার সময় ভীরু কাপুরুষের ন্যায় রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে চলিবে না।

এক সময়ে ভারতের হিন্দুসমাজ উদারতম বীজমন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত সত্যধর্ম্মকে অন্তরে গ্রহণ করিয়া কার্য্যেও পরিণত করিয়াছিলেন বলিয়াই এই আশ্চর্য্য সত্যবাণী এদেশেই প্রকাশ পাইয়াছিল—"নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণবইব"—সমুদ্র যেমন নদনদীসমূহের একমাত্র

গন্তব্যস্থলে, ভগবানও সেইরূপ সকল মানবেরই একমাত্র গম্যস্থল। এই ভাব হইতে বিচ্যুত হইবার ফলে যখন হিন্দুসমাজ কি ধর্ম্মবিষয়ে, কি সামাজিক বিষয়ে, কি রাজনীতিক্ষেত্রে, সকল বিষয়েই শতধাবিভক্ত হইয়া শতবিধ সঙ্কীর্ণতার শত শত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গণ্ডীর পাশজালে আপনাকে আবদ্ধ করিল; যখন হিন্দুসমাজ মুখে উদারতার বড় বড় মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকিলেও কার্য্যে ঠিক তাহার বিপরীত আচরণ করিতে লাগিল, তখনই সেই উন্নত ও সুবিস্তৃত হিন্দুসমাজ অবনতির পিচ্ছিলপথে দ্রুতপদে নামিতে লাগিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের, রাজনীতিকে সত্যধর্ম্মের ভিত্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া, কথা ও কাজে মিল না রাখিয়া, রাজনীতিক্ষেত্রে নামিবার ফলেই আজ হিন্দুমুসলমানের এই ভীষণ বিরোধ। সত্যধর্ম্মের ভিত্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া, কথা ও কাজের মিল না রাখিয়া সমাজগঠনের চেষ্টার ফলেই আজ হিন্দুজাতি ধ্বংসের পথে দণ্ডায়মান। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই প্রকার মুখে উদারতার উৎস ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা ব্রহ্মোপাসকগণ ন্যূনাধিক বলের সহিত প্রচার করিলেও, কার্য্যে অনেক সময়ে তাহার বিপরীত আচরণ করিবার ফলেই, ব্রাহ্মসমাজ আর প্রকৃত উন্নতির পথে পূর্ব্বের ন্যায় দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না—ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে, মনে হয় যেন, একটু পিছাইয়া পড়িতেছেন।

মৈত্রীই নবযুগের যুগধর্ম্ম। আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, বর্ত্তমান যুগের জগতব্যাপী কর্ম্মক্ষেত্রে পরস্পরের আন্তরিক মিলন ও অন্যোন্যসাহচর্য্য অপরিহার্য্য। সেই এক সময় গিয়াছে, যখন ব্রহ্মোপাসকগণ এই প্রত্যক্ষ সত্য মুখে প্রচার করিলেও অভিমানে অহঙ্কারে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় কোন্ দূর-দূরান্তরে ছটকাইয়া পড়িলেন; ছোটখাটো কথায় আহত হইয়া কেহই কাহারও উপর মমতা করিলেন না; সুদীর্ঘকালব্যাপী সম্প্রীতি মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। ইহার ফলে আমাদের প্রিয় ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গে যে কি কঠোর আঘাত পড়িয়াছে, কয়জন তাহা ধীরভাবে চিন্তা করিয়াছেন? এই বিরোধ বিবাদ, মনের অমিল পরিত্যাগ না করিলে আমাদের শ্রেয় নাই। এই মিলনের অভাবে আমাদের শুভকর্ম্মসাধনের প্রচেষ্টাসকল ইচ্ছানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছে না। আমাদের ইচ্ছা, উদ্যোগ ও উৎসাহ সত্বেও সংহতির অভাবে সেই সকল অনুষ্ঠান কত সময়ে নিষ্ফল হইয়াছে, এবং তাহার ফলে আমরা এত মলিন, এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সেই আদিমকালে ব্রহ্মোপাসকগণের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব থাকিবার কারণে, মিলনমন্ত্র কথায় ও কার্য্যে সাধন করিবার ফলে, সত্যধর্ম্মকে মানদণ্ড করিয়া সকল কার্য্য করিবার ফলে, ব্রাহ্মসমাজ দেশের মধ্যে কি প্রবল শক্তিরূপে দাঁড়াইয়াছিল, পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতি পৃষ্ঠায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীকে হত্যার কারণে আজ যে শুদ্ধিসংগঠন দেশবাসীর সম্মুখে বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কে তাহার অগ্রণী?—ঐ ব্রাহ্মসমাজ; কয়জন লোক ইহা জানেন যে, ব্রাহ্মসমাজ জনৈক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত যুবককে অকুতোভয়ে দীক্ষিত করিয়া ব্রহ্মোপাসক হিন্দুসমাজে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন? যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ফলে আজ গৃহলক্ষ্মীগণ সংসার উজ্জ্বল করিতেছেন, কে তাহার পথপ্রদর্শক? ঐ ব্রাহ্মসমাজ। সে সময়ে ব্রহ্মোপাসকগণ অন্তরে মিলিত ছিলেন বলিয়াই এবং তাঁহারা একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া কথায় ও কাজে মিল রাখিয়া চলিতেন বলিয়াই তাঁহারা নানা শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

স্বাধীনতাই ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ। এই স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক অধীনতার সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে। প্রাচীন হিন্দুসমাজ আপনাকে কঠোর সমাজবন্ধনের নিগড়ে আবদ্ধ করিবার ফলে আজ দেখি, হিন্দুর সংখ্যা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে চলিয়াছে। এদিকে ব্রহ্মোপাসকগণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অতিমাত্র পক্ষপাতী হওয়াতে, আমাদের মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলতা অল্পাধিক প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহার কারণ এই যে, ব্রাহ্ম-

উদয় হয় না। আমরা নিজেরা তখন প্রত্যেকে এই বিরাট ঐক্যতানের এক-একটি সুর-তরঙ্গে পরিণত হই। এবং অন্তরাত্মা অক্ষয়ানন্দের সহযোগে স্পন্দিত হইবার নিমিত্ত মহোল্লাসের নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে।

জিনেভা,
১৭ই এপ্রিল, ১৮৫৫।

দিবসটি মেঘমুক্ত, সমুজ্জ্বল, সুখোষ্ণ। চতুর্দ্দিকে পক্ষীকুলের কূজনধ্বনি। নিশার আকাশ নক্ষত্রখচিত। প্রকৃতি সৌন্দর্য্যবসনে আবৃতা—স্নেহশীলা।

প্রায় দুই ঘণ্টাকাল এই বচনাতীত রমণীয় দৃশ্যের মধ্যে আমি আত্মহারা রহিয়াছি। আমি উপলব্ধি করিতেছি, আমি অনন্তস্বরূপের মন্দিরে বর্ত্তমান, অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্মুখে অনন্ত নিখিল জগতে নিখিলপতির অতিথি। নীল ব্যোমস্থিত নক্ষত্ররাজি মর্ত্ত্যলোক হইতে আমার চিত্তকে কোন সুদূরের ঊর্দ্ধলোকপানে আকর্ষণ করে। ঈশ্বরারাধনার জন্য অন্তরের উপর তাহারা কি বচনাতীত শান্তিসুধা ও অমর জীবনরস সঞ্চার করে। মনে হয় আমাদের পৃথিবী একখানি ক্ষুদ্র তরীতুল্য - এই নীলসমুদ্রে ভাসমান। এবম্বিধ প্রগাঢ় এবং প্রশান্ত আনন্দ আমার সমগ্র মানব-অন্তরটিকে পরিপুষ্ট করে, পবিত্র করে ও মহীয়ান করে। আমি ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিলাম—আমার আমিত্ব এক্ষণে কেবলমাত্র কৃতজ্ঞতা ও দাসত্বের সমষ্টি।

বুদ্ধবাণী।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

Busy not yourself anxiously and
unprofitably
About other worlds, Gods, souls, spirits
or demons;
Of thy coming hither and from whence;
Of the soul's existence;
And if it be, of its going hence, when
and unto where.
Nought is proven; all this is unknown
and unknowable,
whilst the duties of life are substantial
and urgent.

আকুল কোরো না চিত্ত সন্ধানেতে বৃথা
কোথা কত লোক দেব আত্মা ভূত প্রেত;
হেথা তুমি এলে কেন, কোথা হতে এলে;
আত্মাই বা আছে কিনা; থাকে যদি তবে,
কোথা হতে কবে কোথা যেতে হবে তব।
প্রমাণ কিছুরি নাই; অজ্ঞাত অজ্ঞেয়
বলে জানি গো এসব; জীবনে কর্ত্তব্য-
সাধন প্রথম কাজ—দৃঢ় ভিত্তি যার॥ বুদ্ধদেব।

বুদ্ধদেবের এই উক্তির কথা বলিয়া অনেকে ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন বিচার আলোচনা করিতে চাহেন না। কিন্তু আমাদের বোঝা উচিত যে, এসকল বিষয়ে বিচার আলোচনা না করিয়া যে উপায় নাই। আমরা প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত—প্রকৃতির বহির্ভূত নই। ইহা যদি ঠিক হয়, তবে কেমন করিয়া অস্বীকার করিব যে, এ সকল বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন নাই? প্রয়োজনই যদি না থাকিত, তবে আমাদের প্রাণের ভিতর এ সকল কথা উঠে কেন? ঐ যে, বুদ্ধদেব বলিলেন—কোথা কত লোক, কত দেবতা, আত্মা প্রভৃতি আছে, তুমি কোথা হইতে এবং কেনই বা এ জগতে জন্মগ্রহণ করিলে, এসকল বিষয়ের বৃথা সন্ধান করিতে অগ্রসর হইও না—এ কথা হয়তো তাঁহার পক্ষে বলা সহজ হইয়াছিল, কিন্তু এভাবে চলা সাধারণ মানবের পক্ষে মোটেই সহজ নয়। প্রকৃতির প্রেরণাতেই যে আমাদের ঐসকল বিষয়ে দৃষ্টি পড়ে—ইহার অর্থ এই যে, যখন ঘটনাচক্রে ঐ সকল বিষয়ের প্রতি আমাদের মনপ্রাণ আকৃষ্ট হয়, তখন যে ঐ সকলের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া থাকিতে পারি না।

এই সকল বিষয়ের সন্ধানকে বৃথা বা নিরর্থক বলাও যায় না। আমরা জগতের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে, এই সকল বিষয়ের আলোচনা কিছুতেই নিষ্ফল হইতে পারে না। এই সকল বিষয়ের আলোচনা হইতেই তো জগতে প্রজ্ঞান বা দর্শনবিভাগের এত উন্নতি হইয়াছে। বুদ্ধদেবের সিদ্ধান্ত যুক্তিপূর্ণ বা ভ্রান্ত, তাহা এস্থলে বিচার যদি বা নাও করি, তাহা হইলেও ইহা তো সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, বুদ্ধদেব নিজেও ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া তাহারই ফলেই তো তাঁহার নিজের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

বুদ্ধদেব তো বলিলেন, আত্মা আছে কি না বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তিনি তো এ প্রশ্নের নিরাকরণ করিলেন না যে,—আত্মা আছে

কি না যদি তাহারই কোন ঠিক-ঠিকানা না রহিল, তবে জীবনের পথে কর্ত্তব্যের ভিত্তি রহিল কোথায়? একথা বুঝি যে, আত্মা আছে এবং তাহার অনন্ত উন্নতির অভিমুখে গতি আছে এবং মন্দ কাজ করিয়া সেই গতির পথে বাধা আনয়ন করা উচিত নহে; এবং সেই আত্মার অন্তরেই ভালমন্দ বিচারের, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য জানিবার ভিত্তি সুদৃঢ়রূপে নিহিত আছে—ইহা স্বীকার করিলে তবে আমাদের ভালর পথে অগ্রসর হওয়া এবং সমাজকে, দেশকে ও জগতকে সেই পথে চলিতে বলা সহজ হয়। আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা ছাড়িয়া কর্ত্তব্যের কথা কি প্রকারে আসিতে পারে, তাহা আমাদের ধারণাতেই আসে না। হইতে পারে, আমি প্রকাশ্যে ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতির বিষয় আলোচনা না করিয়া আমার জীবনের কর্ত্তব্য করিয়া চলিতেছি। কিন্তু তাহাতে এইমাত্র বুঝায় যে, মুখে বা প্রকাশ্যে ঐ আলোচনা না করিলেও অন্তরে নিশ্চয়ই স্থির করিয়া লইয়াছি যে, আত্মা আছে এবং সেই আত্মার ভিতরেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ পাইতেছি—তবেই না সেই কর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য জানিয়া সেই কর্ত্তব্যের পথে চলিতেছি। ইহাই যদি ঠিক হয়, তবে ঐ আত্মার অস্তিত্ব আলোচনা করিতে গিয়াই ঈশ্বর এবং তাহারই সঙ্গে পরলোকেরও অস্তিত্ববিষয়ক আলোচনা স্বতই উপস্থিত হয়, এবং তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করা অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

বুদ্ধদেব বলিতেছেন—আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতির অস্তিত্ববিষয়ে কোন কিছু প্রমাণ নাই। বলিলেই তো সকলে শুনিবে না। কত শত যোগীন্দ্র, ঋষি-মুনিগণ,—তাঁহারা যে আবার ঐ সকলের অস্তিত্ব বিষয়ে জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিয়াছেন। এ বিষয়ে যখন এই রকম বিরোধ দেখা যাইতেছে, তখন সাধারণ মানবের পক্ষে কঃ পন্থা—আমরা কোন্ পথ ধরিয়া চলিব? ইহার সহজ উপায় হইতেছে—হৃদয় দিয়া বিচার করিয়া সত্যকে গ্রহণ করা। আমার হৃদয়, তোমার হৃদয় এ বিষয়ে কি বলিতেছে? এ কথা কি কখনও হৃদয়ে সায় পায় যে, আমার ভিতরে তোমার ভিতরে তাহার ভিতরে আমাদের কাজকর্ম্মের একজন পরিচালক নাই? আমরা তো জানি যে, আমাদের জিহ্বা কথা কহিতেছে, হস্ত স্পর্শ করিতেছে ইত্যাদি। কিন্তু ইহা তো স্পষ্ট অনুভূত হয় যে আমিই ঐ কথা কওয়াইতেছি, ঐ স্পর্শ করাইতেছি; আমারই ইচ্ছা অনুসারেই ঐ কথা বাহির হইতেছে, হস্ত স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইতেছে। এই যে আমি, এই আমিকে তুমি আত্মাই বল আর যাহাই বল—সত্যটা দাঁড়াইতেছে এই যে, আমি বা আত্মা বলিয়া একটা কিছু আছে। সেই আমি বা আত্মাকে আমরা চর্ম্মচক্ষুতে দেখিতে না পাইলেও উহা আছে এবং উহার ভিতরেই কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্যের জ্ঞান নিহিত আছে। প্রবাদ আছে—চুল টানিলেই মাথা আসে। সেই প্রকার আত্মা স্বীকার করিলেই ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতি তত্ত্বগুলি স্বীকার করা অনিবার্য্য। এগুলিকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিলে নিজের উপর অবিচার করা হয়, সমগ্র মানবসমাজের প্রতি অবিচার করা হয়। আর একটী কথা ভাবিয়া দেখা উচিত যে, অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিলেও কতকটা জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ের ভাব আপনিই আসিয়া পড়ে। সোণার পাথরবাটি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে সোণারও জ্ঞাত-জ্ঞেয়ত্ব এবং পাথরেরও জ্ঞাত-জ্ঞেয়ত্ব আপনিই আসিয়া পড়ে না কি? আমরা আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতিকে সম্পূর্ণভাবে জানিতে না পারিলেও সে সম্বন্ধে যে কিছু না কিছু জানিতে পারি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই—প্রতি মানবের হৃদয় এবং সমগ্র মানবসমাজের ইতিহাস সে বিষয়ে গভীর সাক্ষ্য প্রদান করে। এ বিষয়ে উপনিষদের ঋষির নিকট কি গভীর শান্তিপূর্ণ আশ্বাসবাণী শুনিতে পাই—"ঈশ্বরকে যে জানা যায় না তাহাও নহে, জানা যে যায় তাহাও নহে; তাঁহাকে জানা যায় না এবং জানা যায়, এই কথার মর্ম্ম যিনি জানিয়াছেন তিনিই তাঁহাকে যথার্থরূপে জানিয়াছেন।" আর ঐ যে ঋষি উদাত্তস্বরে হিমাচলের শিখরদেশ হইতে নিজের অন্তরের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ঘোষণা করিয়া ব্যক্ত করিলেন—"আমি সেই তিমিরাতীত মহান পুরুষকে জানিয়াছি", এই সরল প্রত্যক্ষ অনুভূতি কি আমরা অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিতে পারি, দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারি? কখনই নয়।

আমরা আত্মা ঈশ্বর প্রভৃতি সুদৃঢ় সত্যের সন্ধানে সকলকে অগ্রসর হইতে বলি বলিয়া যে কাহাকেও কর্ত্তব্যসাধনে পশ্চাৎপদ হইতে বলি, তাহা নয়। প্রত্যুত আমাদের মত এই যে, ভগবান বা অন্তর্যামী আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে সমুদয় হৃদয়ের সহিত প্রীতি করিলে আমাদের কর্ত্তব্যের সুদৃঢ় ভিত্তি পাই এবং তখন কর্ত্তব্যসাধন অনিবার্য্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। এই কারণে আমরা প্রকৃত ধর্ম্মের দুইটী অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট করি—ভগবানকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন। প্রীতি একাত্মক হইতে পারে না; একাধিক সচেতন পুরুষের মধ্যেই এই প্রীতির সম্বন্ধ সম্ভব হয়। প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই পরস্পরকে জানিতেই হইবে যে কোন্ কার্য্যটী কাহার প্রিয়। কেবল তাহাই নহে, যাঁহাদের মধ্যে অকৃত্রিম প্রীতি থাকে, স্বভাবতই তাঁহাদের পরস্পরের প্রিয়কার্য্যসাধনে অনুরাগ জন্মে। প্রীতি ও প্রিয়কার্য্যসাধনের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন ও অপরিহার্য্য সম্বন্ধ আছে। তাই ঈশ্বরকেও সত্যসত্য প্রীতি করিলে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে নিশ্চয়ই আমাদের মতি হইবে। আর তিনি আমাদিগকে ভাল বাসেন বলিয়া সর্ব্বদাই আমাদের প্রিয়কার্য্য সাধনে নিরত আছেন। কিন্তু তিনি যে প্রিয়কার্য্য সাধন করিবেন, তাহার সঙ্গে মঙ্গলভাব অবিচ্ছিন্ন। তিনি আমাদের সর্ব্বদাই মঙ্গলসাধন করিতেছেন—তিনি মঙ্গলবিধাতা।

আমরা এই কথা বলি, বুদ্ধদেব বলুন অথবা যিনিই বলুন যে, ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, তাহার প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন না করিয়া নিজের হৃদয়ের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি স্থাপন করিয়া দেখ, নিজের হৃদয়ে তুমি কি বাণী পাও। অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, সেই বাণী আমাদিগকে বজ্রনির্ঘোষে অনুক্ষণ বলিতেছে যে, আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় নহে, কিন্তু জ্ঞাত ও জ্ঞেয়। জ্ঞাত ও জ্ঞেয় বলিয়াই ভারতের ঋষিরা সরল ভাষায় ঈশ্বরকে প্রাণের প্রাণ ও আত্মার আত্মা রূপে ঘোষণা করিতে পারিয়াছেন; আত্মাকে বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ বলিতে পারিয়াছেন; এবং পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বুদ্ধদেব তাঁহার সমসাময়িক লোকদিগকে অনাচার কদাচার হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্যই শুভকর্ম্ম অনুষ্ঠানের প্রতি জনসাধারণের সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমরা শুভ কর্ম্ম অনুষ্ঠানেও বিরত হইব না এবং সেই সঙ্গে সমস্ত কল্যাণের মূল উৎস ভগবানের চরণ ধরিয়া থাকিতেও বিরত হইব না। সংশয়বাদ আমাদের অন্তর হইতে অপহৃত হউক। শ্রদ্ধা আমাদের সমস্ত মনপ্রাণকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখুক।

দেবেন্দ্রনাথের বাল্যকথা।

(আচার্য্য শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ)

মা গোসাঁই ও বৈষ্ণবী শিক্ষয়িত্রী। *

"নীলমণি ঠাকুরের পরিবারবর্গ নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন, এবং খড়দহের গোস্বামীদের শিষ্য ছিলেন। সেই গোস্বামীদের নিকটে তাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করিতেন। দীক্ষাগুরুর পত্নীকে 'মা-গোসাঁই' বলা হইত। অনেক সময়ে গুরুর অভাবে অথবা গুরুর পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক না হইলে, গুরুপত্নীরাও দীক্ষা দিতেন। মা-গোসাঁইরা শিষ্য-বাড়ীতে আসিবার সময় প্রায়ই নিজের কন্যা পুত্রবধূ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া আসিতেন। তাঁহারা আসিলে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে এবং নানারূপ ন্যায় ও অন্যায় দাবী মিটাইতে শিষ্যদের বিব্রত হইতে হইত। আমার মনে হয় যে ইহাই লক্ষ্য করিয়া মহর্ষি তাঁহার পিতামহীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'কিন্তু তিনি মা-গোসাঁইয়ের সতত যাতায়াত বড় সহিতে পারিতেন না।'

রামলোচন ঠাকুরের দীক্ষাগুরুর নাম ছিল হরিমোহন গোস্বামী; ইহার পত্নী কাত্যায়নী দেবীই অলকাসুন্দরীর দীক্ষাগুরু ছিলেন। তিনিই আত্মজীবনীতে বর্ণিত 'মা-গোসাঁই'।

'মা-গোসাঁই' ছাড়া আর এক শ্রেণীর বৈষ্ণবী শিক্ষয়িত্রী সে যুগে পরিবারে পরিবারে গমন করিয়া মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতেন। দ্বারকানাথের পরিবারেও তাহা করা হইত। এই বৈষ্ণবীগণও খড়দহের গোস্বামীদের বিশেষ জানিত না হইলে পরিবারে অবাধ প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহারা প্রতিদিন পড়াইতে আসিতেন; অনেক সময়ে ছাত্রীদের বাটীতেও থাকিতেন। এই সকল বৈষ্ণবীর শিক্ষাদান কেবল বাংলায় শেষ হইত না; তাঁহারা সংস্কৃত বৈষ্ণব স্তবগুলিও অর্থের

* 'মা-গোসাঁই' ও বৈষ্ণবী শিক্ষয়িত্রীদের সম্বন্ধে এই নিবন্ধটি শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিয়া দিয়াছেন।

সহিত শিক্ষা দিতেন। (এই শিক্ষাদানের নিদর্শন, চমৎকার হস্তলিপিতে বৈষ্ণবীকর্ত্তৃক লিখিত বাংলা অনুবাদ সহ সংস্কৃত পুঁথি, আমার নিকটে আছে)। এই সকল বৈষ্ণবীদের কিন্তু 'মা-গোসাঁই' বলা হইত না। এই সকল বৈষ্ণবীরা পরিবারের কর্ত্রীর সহিত 'মা' প্রভৃতি পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন করিতেন, এবং তদনুসারে পরিবারের অন্যান্য সকলের সহিত তাঁহাদের যথোপযুক্ত সম্বোধনের সম্বন্ধ হইত।"

দেবেন্দ্রনাথ "বিলাসের আমোদে মগ্ন" কবে হইয়াছিলেন ?

"চৌদ্দ বছর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন এবং বোধ হয় ষোল কি সতের বছর বয়সে হিন্দু কলেজ ছাড়িয়া থাকিবেন। সুতরাং এই ষোল হইতে আঠারো বছর পর্য্যন্ত, তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে, তিনি "বিলাসের আমোদে ডুবিয়াছিলেন" (অজিত ৪৭)।

দ্বারকানাথ স্বয়ং শুদ্ধাচারী মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে কলিকাতার ধনীদিগের অনুকরণে ও তাঁহাদের অনুরূপ চালে বিলাসের ও আমোদের আয়োজন করিতে হইত; এবং পুত্রগণ বয়স্ক হইলে, সামাজিকতার খাতিরে তাহাদিগকেও এই সকল আমোদের সভায় লইয়া যাইতে হইত। কিন্তু অপরিণত বয়সে তাহারা কেহ স্বয়ং বিলাসিতায় ও আমোদে মগ্ন হয় ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না; এবং এই জন্য তিনি এসময়ে দেবেন্দ্রনাথের বিলাসপরায়ণতা ও অত্যধিক ব্যয়শীলতায় বিরক্ত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে কলিকাতায় ধনীদিগের "বিলাসের আমোদ" যে সুনীতি ও সুরুচি উভয় হইতে ভ্রষ্ট হইত তাহা বলাই বাহুল্য। কিশোর দেবেন্দ্রনাথ এ সময়ে যে পথে চলিয়াছিলেন, তাহাও তদ্রূপই ছিল। ইহাতে তাঁহাকে দোষী করা যায় না; বরং আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, এমন অবস্থা হইতেও ঈশ্বর তাঁহাকে নিজের দিকে টানিয়া লইলেন।

দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমার চারিদিকে কেবল বিলাসের ও আমোদের অনুকূল বায়ু অহর্নিশি প্রবাহিত হইতেছিল। এত প্রতিকূল অবস্থাতেও ঈশ্বর আপনি দয়া করিয়া আমার মনে বৈরাগ্য দিলেন ও আমার সংসারাসক্তি কাড়িয়া লইলেন; এবং তাহার পরে সেই আনন্দময় স্বীয় আনন্দের ধারা আমার মনে বর্ষণ করিয়া নূতন জীবন প্রদান করিলেন।" ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে মানুষের জীবনপরিবর্ত্তনই ভগবানের করুণার অনন্ত প্রকাশ; সেই অনন্ত প্রকাশ দেবেন্দ্রনাথের জীবনে অতি সমুজ্জ্বল।

দেবেন্দ্রনাথের এই "বিলাসের আমোদে মগ্ন" হওয়ার বিশেষ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কেবল তাঁহার এই সময়ের সাজসজ্জা ও ব্যয়বাহুল্যের বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ অপরের লেখা হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যাঁহাকে আমরা সুদীর্ঘকাল শুভ্র বস্ত্র পরিহিত শান্ত সমাহিত তপস্বীর মূর্ত্তিতে দেখিয়া আসিয়াছি, তাঁহার কৈশোরের বাবুমূর্ত্তির বর্ণনা আমাদের চিত্তে কুতূহলের উদ্রেক করে এবং ঈশ্বরের নবজীবনপ্রদ করুণার সাক্ষ্য প্রদান করে।

শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার লিখিয়াছেন, "আমার পিতামহ গল্প করিতেন, তাঁরা দেখিয়াছেন, আট ঘোড়ার গাড়ী হাঁকাইয়া পরম রূপবান এক যুবা বুক ফুলাইয়া কলিকাতার রাস্তা কাঁপাইয়া যাইত। জিজ্ঞাসা করিলেন 'ইনি কে?' 'আরে কে তা জান না? দ্বারকানাথ ঠাকুরের বড় ছেলে হাওয়া খেতে বাহির হয়েছেন।' আমাকে মহর্ষির এক কন্যা গল্প করিয়াছেন যে, 'ঠাকুরদাদা মশাই যখন বেঁচে ছিলেন, বাবা মহাশয়ের table expenses ছিল daily ৩০০৲'—বড়ছেলে বন্ধুবান্ধবদের লইয়া আহারে প্রতিদিন ব্যয় করিবে ৩০০৲ টাকা।" (তত্ত্বকৌমুদী ১৮৪৬ শকের ১৬ই ভাদ্রের সংখ্যা, ১১৭পৃষ্ঠা)।

তাঁহার কালের কোন প্রাচীন লোকের কাছে শুনিয়াছি যে, কলিকাতা সহরে তখন তাঁহার 'বাবু' খ্যাতি রটিয়া গিয়াছিল। জগদ্ধাত্রী ভাসানের সময় তিনি যেমন বেশভূষা পরিয়া বাহির হইতেন, অনেক বড়লোক তাঁহার অনুকরণ করিতেন।......

এই সময়ে তিনি একবার প্রায় লাখ টাকা খরচ করিয়া খুব ধুমধামের সহিত বাড়ীতে সরস্বতী পূজা করিয়াছিলেন। সেই পার্ব্বণে সহরে গাঁদা ফুল ও সন্দেশ দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছিল। গাঁদা ফুল দিয়া তিনি প্রকাণ্ড এক সামিয়ানার মত তৈরী করিয়াছিলেন। প্রতিমা এত মস্ত হইয়াছিল যে, বিসর্জ্জনের সময়ে নানা কৌশলে তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিতে হয়।"—(অজিত, (৪৬, ৪৭)।

শ্মশানে আনন্দ হারাইয়া দেবেন্দ্রনাথের অশান্তি।

এই অশান্তির অবস্থাকে দেবেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অভিনন্দনের উত্তরে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, "সেই উদাস ভাবের আনন্দে হৃদয় এমনি বিকশিত হইল যে, সে রাত্রি চক্ষুতে নিদ্রা আইল না। তাহার পরদিনে সে আনন্দ চলিয়া গেল। তখন আমি ঘোর বিষাদে, অকূল চিন্তাতে নিমগ্ন হইলাম। পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় সেই আনন্দের আকর প্রেমের সাগর সত্যস্বরূপের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। মনে হইতে লাগিল যে চিত্তপটের জ্ঞানভূমিতে অনন্তের যে সুন্দর ছবি মুদ্রিত রহিয়াছে, তাহা কি কেবল ছবি মাত্র? তাহা কি মনের ভাবমাত্র? সেই বাস্তবিক সত্য কি নাই, যাহার এই প্রতিবিম্ব, যাহার এই প্রতিরূপ? এই প্রকারে

বুদ্ধির মহা আন্দোলন চলিল। এই আন্দোলন ও আলোচনাতে আমার মন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইতেছিল, তখন হঠাৎ উপনিষদের এক ছিন্নপত্র আমার হস্তে নিপতিত হইল।" —(তব ৩৩০)।

দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক ১৮৩৮ সালের পূর্ব্বে পঠিত যুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র।

এই সময়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক ও বিপ্লববাদী লেখকগণের এবং হিউম প্রভৃতি নিরীশ্বরবাদী গ্রন্থকারদিগের মত ও শিক্ষা হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে অতিশয় প্রসার লাভ করিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ সেই দার্শনিকদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন এবং অপর কয়েকজনের মূলগ্রন্থ পাঠ না করিয়া থাকিলেও পাঠক্সূত্রে তাঁহাদের মত ও শিক্ষার সহিত তিনি যে পরিচিত হইয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

(১) "প্রকৃতির অধীনতাই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব" এই ভাবটি হয়তো তিনি Julien offroy dela Mettrie (1709—1751) হইতে লাভ করিয়া থাকিবেন। এই লেখকের মতে মনের সকল ক্রিয়া শরীরের গঠনের উপর নির্ভর করে, শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, এবং শরীরের মৃত্যুতে আত্মারও ধ্বংস হয়। এই জড়বাদী দার্শনিকদিগের রচনাবলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছিল Baron Paul Heinrich Dictrich von Holbach (1723—1749) প্রণীত Systune dela nature etc.। তাহাতে স্পষ্টতঃ জড়বাদ ও নিরীশ্বরবাদের সমর্থন এবং মানবাত্মার স্বাধীনতার মতের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। (২) দেবেন্দ্রনাথ যে ইংরাজ দার্শনিক John Locke (1632—1704) প্রণীত Essay Concerning Human understanding পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। ফটোগ্রাফের কাচপাত্রে পতিত প্রতিবিম্বের তুলনার দ্বারা মানবের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উৎপত্তির ব্যাখ্যা Lockeই করিয়াছিলেন। আমরা বিষয়জ্ঞানের সহিত আপনাদিগকেও জানি এই তত্ত্বের আভাসও Lockeএর পুস্তকে আছে। (৩) সম্ভবতঃ David Hume (1711—1776) প্রণীত Enquiry Concerning Human understanding নামক গ্রন্থও তিনি এই সময়ে পড়িয়া থাকিবেন; কারণ হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে এই গ্রন্থের বিশেষ সমাদর ছিল। (৪) আত্মজীবনীর চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'প্রয়োজন-বিজ্ঞানবান্' ঈশ্বরের কথা পড়িয়া মনে হয় যে তিনি Systemetic materialissmএর অন্যতম প্রবর্ত্তক Gassaudির (1592—1655) সহিত এবং ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক Sir Robert Boyle (1627—1691) রচিত Disquigitiou about the Final Causes Natural Thing নামক পুস্তকের সহিত পরিচিত ছিলেন। (৫) কিন্তু এখনও তিনি Thomas Reid প্রমুখ Scottish দার্শনিকগণের সহিত পরিচিত হন নাই। আত্মজীবনীর চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আলোক লাভের পরে, প্রথমে উপনিষৎ হইতে এবং ক্রমশঃ এই Scottish দার্শনিকগণের রচনা হইতে, তিনি নিজ সিদ্ধান্তসকলের সার প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত সময়ে তিনি কেবল হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে বহুলভাবে পঠিত ও সমাদৃত য়ুরোপীয় দর্শনের পুস্তকগুলিরই সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন; তাহাতেই তাঁহার মনের সংগ্রাম এত বাড়িয়া গিয়াছিল এবং তিনি 'প্রকৃতি'কে পিশাচী বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন।

প্রথমবয়সে দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মবিশ্বাস।

"প্রথম বয়সে আমার নিকটে এই নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশ অনন্তদেবের পরিচয় দেয়। একদিন শুভক্ষণে এই অগণ্য নক্ষত্রপূর্ণ অনন্ত আকাশ আমার নয়নপথে প্রসারিত হইয়া প্রদীপ্ত হইল। তাহার আশ্চর্য্য ভাবে আমার সমুদয় মন সমুদয় আত্মা আকৃষ্ট হইল। অমনি বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়া সিদ্ধান্ত করিল যে এ কখন পরিমিত হস্তের রচনা নহে। সেই মুহূর্ত্তে অনন্তের ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হইল। তখন আমার পাঠ্যাবস্থা। একথা অদ্যাপি আমি কাহারো নিকটে প্রকাশ করি নাই। আপনাদের অদ্যকার সৌহার্দ্দ্যে বাধ্য হইয়া হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তাহা এখন ব্যক্ত করিতেছি।

"প্রথমে এই অনন্ত আকাশ হইতে অনন্তের পরিচয় পাইলাম, যেন আবরণ ভেদ করিয়া অনন্ত ঈশ্বর আমাকে দেখা দিলেন, যেন যবনিকার একপার্শ্ব হইতে মাতার বদন দেখিতে পাইলাম। সেই প্রসন্ন বদন আমার চিত্তপটে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

"প্রথম বয়সে উপনয়নের পর প্রতি নিয়ত যখন গৃহেতে শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা দেখিতাম, প্রতি বৎসর যখন দুর্গাপূজার উৎসবে উৎসাহিত হইতাম, প্রতিদিন যখন বিদ্যালয়ে যাইবার পথে ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া পাঠের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য বর প্রার্থনা করিতাম, তখন মনের এই বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বরই শালগ্রামশিলা, ঈশ্বরই দশভুজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী।

"কিন্তু সেই শুভক্ষণে যেমন এই অনন্ত আকাশের উপরে আমার নয়ন-যুগল উন্মীলিত হইল, অমনি আমার জ্ঞান উন্মীলিত হইয়া মনের পৌত্তলিক ভাবকে ক্ষণকালের মধ্যে তিরোহিত করিয়া দিল। অমনি জানিলাম,

অনন্ত আকাশের অগণ্য নক্ষত্র পরিমিত হাতের কার্য্য নহে, অনন্ত পুরুষেরই এই অনন্ত রচনা।

"প্রথম উপদেশ অনন্ত আকাশ হইতে পাইলাম। পরে শ্মশানে বৈরাগ্যের উপদেশ হইল। সহসা উদাসীনের আনন্দ হৃদয়ে উত্থিত হইল।"—(ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অভিনন্দনের উত্তর; তব, ৩২৮—৩৩০)।

অনন্ত আকাশ দর্শনে দেবেন্দ্রনাথের মনে এই ভাবের উদয় আনুমানিক ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে, হিন্দু-কলেজে পাঠকালে হইয়া থাকিবে।

ডাক্তার এডওয়ার্ড বাইল্‌স কাউয়েল।

পূর্ব্বানুবৃত্তি

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

"The London quaterly" নামক পত্রিকায় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই সংখ্যায় কাউয়েল "La Fontaini and his fables" নামে একটা রচনা প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে উক্ত লেখকের একটী গল্পের সহিত সংস্কৃত "হিতোপদেশের" "হংসকচ্ছপকথা" নামক গল্পটীর সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে "Macmillan's Magazine"এর এপ্রিল সংখ্যায় বাঙলা উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনীর" কাউয়েল-লিখিত একটী সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার মুখবন্ধে কাউয়েল স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করেন যে,—"ভারতবর্ষই উপন্যাসের জন্মভূমি এবং ইউরোপীয় মধ্যযুগের অধিকাংশ লোকপ্রিয় গল্পেরই মূল উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে; প্রাচ্যদেশজাত গল্পমালার সুবিন্যস্ত সংস্করণ, সেই পুরাতন উপকথাগুলি নবযুগের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক গল্পসাহিত্যের ছায়ায় অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে এখনও তাহারা পূর্ব্বাকারেই জনপ্রিয় কল্পনাসমূহের মধ্যে অবস্থান করিতেছে।

"প্রত্যেক গল্পের প্রারম্ভে একটী সন্তানহীন রাজার উল্লেখ থাকিবেই থাকিবে; ঐ রাজা অবশেষে কোন ব্রতাদি পালন করিয়া একটী অতুলনীয় পুত্র লাভ করেন। প্রত্যেক রাজকন্যা কোন স্বয়ম্বরসভায় সমাগত পাণিপ্রার্থীদিগের মধ্য হইতে তাঁহার পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন, এবং প্রত্যেক গল্পই দেহান্তরপ্রাপ্তিবিষয়ক সার্ব্বজনীন বিশ্বাস হইতে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে উদ্ভূত অমানুষিক রূপান্তরপ্রাপ্তি প্রভৃতিতে পূর্ণ থাকিবেই থাকিবে।

"যাহা হউক, একটী আধুনিক পদ্ধতি অবশেষে প্রচলিত হইয়াছে। ইহা বুজরুকির ক্ষেত্র হইতে বাস্তবজীবনের গভীরতর অনুরাগসমূহের দিকে গল্পসাহিত্যের মোড় ফিরাইতে সুরু করিয়াছে। ইহা ভারতে ইংরাজীশিক্ষার পরিণাম বলিয়া অনুরাগব্যঞ্জক।" অতঃপর কাউয়েল গল্পাংশটীর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং উহা হইতে কতকগুলি নির্ব্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, বাহুল্যভয়ে তাহা আর এখানে সংযোজিত করিলাম না।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে কাউয়েল সংস্কৃত নাটক "বিক্রমোর্ব্বশী"র ইংরাজী অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। এই বৎসরই তিনি "বররুচি"র "প্রাকৃত" ব্যাকরণ প্রকাশ করিয়া উইল্‌সন্ মহোদয়কে উপহার দেন। উহার আর একটী সংস্করণ পরে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কাউয়েল উইল্‌সনের ঋগ্বেদানুবাদ ও Elphinstoneএর ভারতবর্ষের ইতিহাসের সম্পাদকতা করেন; উভয় পুস্তকই ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কাউয়েল সাহেব কেম্ব্রিজে অধ্যাপক-পদপ্রাপ্তির জন্য যে আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তাঁহার "কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের" এবং উদয়নের "কুসুমাঞ্জলি"র ইংরাজী অনুবাদের কথা পাওয়া যায়, কিন্তু কবে তিনি ঐ সকল অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কাউয়েল "স্বপ্নেশ্বরে"র টীকার সহিত "শাণ্ডিল্যে"র ভক্তিসূত্রের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। অবশেষে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের "Extra Asiatic society Journal"এর ডিসেম্বর সংখ্যায় তাঁহার বাঙালী কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কনের চণ্ডীকাব্যের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। শোনা যায়, রামবাগান দত্ত-পরিবারের বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত তাঁহাকে উক্ত বিষয়ে প্রথম প্ররোচিত করেন। এই গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয়ই সুপ্রসিদ্ধ কুমারী তরু ও অরু দত্তের পিতা। কলিকাতায় থাকিতে থাকিতেই এই দত্ত মহাশয়দিগের সহিত কাউয়েলের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গিয়াছিল; কাউয়েলের তৎকালীন পত্রগুলিতে এই দত্তদের বিষয় উল্লেখ দেখা যায়।

কোন একজন বন্ধুর অনুরোধে কাউয়েল পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করেন; ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞগণের প্রাথমিক ইতিহাস বলিয়া ইহার যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। George Cowell লিখিত কাউয়েল সাহেবের জীবনীর শেষভাগে এই সমগ্র ইতিহাসটী প্রদত্ত হইয়াছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল তারিখের "The Times" নামক সংবাদপত্রে কাউয়েল "A letter on the Caloutta Presidency and Sanskrit Colleges" নামক একটী রচনা প্রকাশ

করেন। দুঃখের বিষয় উক্ত রচনাটী সংগ্রহ করিতে না পারায় এই প্রবন্ধে উঁহার সারসন্নিবেশ করিতে পারিলাম না।

কাউয়েল-রচিত সংস্কৃত শ্লোকসমূহ মৌলিক ও সুললিত, ঐগুলি এরূপ নির্ভুল যে, কখনই পাশ্চাত্য পণ্ডিতের রচনা বলিয়া মনে হয় না *। তদীয় অধ্যক্ষতাকালীন সংস্কৃতকলেজের প্রত্যেক পুরস্কারবিতরণী সভায় স্বকীয় বঙ্গভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতার উপসংহারে তিনি প্রত্যেক বৎসরই নিয়মিত ভাবে এক-একটী স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে বিস্ময়বিমূঢ় করিয়া তুলিতেন। দুঃখের বিষয়, ঐ সকলের একটী মাত্র আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি—উহা পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে—এক্ষণে ঐরূপ আর একটী কবিতার তদ্রচিত ইংরাজী অনুবাদ পাদটীকায় প্রদত্ত হইল †।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কাউয়েলের প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী পরলোক গমন করেন। জীবনের এই মহীয়সী সঙ্গিনীর মরণে কাউয়েল যে বিশেষ ব্যথিত হইয়া পড়েন তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার প্রিয় পিত্রালয় ব্যামফোর্ড গ্রামের গীর্জ্জাঙ্গনে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নীরবে সুসম্পন্ন হয়।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ভট্ট মোক্ষমূলর পরলোক গমন করেন; অক্সফোর্ডে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ বিশেষ চেষ্টা হয়। কাউয়েল সাহেব উক্ত কার্য্য সম্পাদনের জন্য প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করেন। স্মৃতিরক্ষা তহবিলে ২৫০০ পাউণ্ড সংগৃহীত হইয়াছিল। কাউয়েল উহাতে চাঁদা স্বরূপ পাঁচ পাউণ্ড প্রদান করেন; ঐ সংগৃহীত মুদ্রাঙ্কের আয় হইতে ভারতীয় ভাষা, প্রত্নতত্ব, ধর্ম্ম এবং ইতিহাস প্রভৃতির উন্নতির জন্য সাহায্য করা হইবে স্থির হয় এবং Prof Hubert Herkomer R. A. প্রদত্ত মোক্ষমূলরের একটী তৈলচিত্র "All Soul's College"এর সুবৃহৎ কক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নীরবকর্ম্মী কাউয়েলের দানশীলতা সর্ব্বজন বিদিত না হইলেও একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় করুণা তাঁহার অন্তরের গোপন নির্ঝরিণী। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, কলিকাতায় অবস্থান কালে তিনি বহুসংখ্যক ছাত্রকে ভরণপোষণাদি দ্বারা সাহায্য করিতেন। ঐ ছাত্রসমূহের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় নীলমণি মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন ছিলেন *। কাউয়েল-দম্পতী কলিকাতা পরিত্যাগ কালে তাঁহাদের পুস্তকের অধিকাংশই সংস্কৃত কলেজে অর্পণ করেন এবং সংস্কৃতকলেজে ব্যাকরণ শিক্ষার উন্নতির জন্য বৃত্তি প্রদানোদ্দেশ্যে কতকগুলি মুদ্রা প্রদান করেন, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এইগুলি কাউয়েল মহোদয়ের দানশীলতার বিশিষ্ট নিদর্শন। যে ক্ষুদ্র পাঠশালাটী তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনবিটপীর অঙ্কুরোদ্গমের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল সেই "Ipswich Grammar School"টীও তাঁহার নীরব দান হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কাউয়েল তাঁহার ভ্রাতা মরিসকে উক্ত বিদ্যালয়ে "কাউয়েল পুরস্কার" নামক একটী বার্ষিক পুরস্কার বিতরণের জন্য দুই শত পাউণ্ড প্রদান করেন। কাউয়েলের মৃত্যুকালীন ইচ্ছানুসারে তাঁহার সুবৃহৎ গ্রন্থাগারটী চারি ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকে প্রদত্ত হয়। দ্বিতীয় অংশটী "Corpus Christi College"এর গ্রন্থাগারে অর্পিত হয়। ভূতত্ববিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী এবং প্রাচীন মুদ্রা সম্বলিত তৃতীয় অংশটী "Fetzwilliam Museum"কে প্রদত্ত হয়। অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগটী "Girton College Library"তে অর্পিত হয়। এই পুস্তকসমূহ ব্যতীত কাউয়েল ১৫০০ শত পাউণ্ড "Corpus Christi College"এর অধ্যক্ষগণের হস্তে, তাঁহার নিজ নামে "গণিত কিংবা Classic" শিক্ষার্থ ছাত্রদিগের বৃত্তি প্রদান মানসে সমর্পণ করিয়া যান।

কাউয়েলের চিত্ত চিরকালই শিশুর ন্যায় সরল ছিল, তিনি কখনও আপনাকে প্রচারিত করিতে ভাল বাসিতেন না; এই কারণ বশতই তিনি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে "Congress of Orientals" এবং "Stockholom"এর অধিবেশনের প্রতিনিধি-পদ প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহার সাধুজনোচিত অমায়িক ব্যবহার সকলকেই আকৃষ্ট করিত। তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া ছাত্রগণ কখনও শিক্ষকের গাম্ভীর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। অসীম বিদ্যাবত্তা সম্পন্ন একজন মনীষীর পক্ষে উহা একটি অসাধারণ গুণ বলিতে হইবে। যথার্থ পণ্ডিত (Savant) বলিতে যাহা বুঝায় কাউয়েল প্রকৃতই তাহা ছিলেন।

---

* উহাদের কয়েকটী পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

† "The sweet taste in poetry like white candied sugar, attracts the entire soul of the feeble minded, but he who is strong in mind and thinks himself a man, is not lured by the bait of a sweet taste."

(A portion of the Cowell's letter, Dated 1861, Sept 9)

* "I was indebted to you for my education" (a portion of Nilmoney Mookerjee's letter to Cowell, Cowell's Life—Page 446)

তাঁহার বহুভাষাভিজ্ঞতার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইউরোপীয় প্রধান প্রধান ভাষা এবং প্রাচ্য পারসী প্রভৃতি ভাষা ছাড়া তিনি ভারতীয় সংস্কৃত, পালি, বাঙলা ও হিন্দি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কেম্ব্রিজে অধ্যাপনা কালে তাঁহাকে "পারসীক"দিগের প্রাচীনতম গ্রন্থ "জেন্দআভেস্তা"ও অধ্যাপনা করিতে হইত। ইহা প্রাচীন পারসীক ভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞান ব্যতীত কখনও সম্ভব হইত না। উদ্ভিদবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্যাতেও তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃত-শাস্ত্র মহোদধির প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এতাদৃশ অসংখ্য গুণান্বিত হইয়াও তিনি অতিশয় বিনয়ী ছিলেন। প্রথম দৃষ্টিতে তাঁহাকে একজন ধর্ম্মাচার্য্য বলিয়াই মনে হইত। বস্তুতই ভারতের বহু ব্যক্তি তাঁহাকে একজন ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়াই জানিতেন। খৃষ্টধর্ম্মে নবদীক্ষিত বহু ভারতীয় যুবক তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। খ্রীষ্টধর্ম্মে নবদীক্ষিত ভগবান চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উঁহাদের অন্যতম ছিলেন; ইনিও কাউয়েলকে পিতৃসম্বোধন করিয়া পত্রাদি লিখিতেন। একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভদ্রলোক একবার কাউয়েলের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে "কাউয়েল সাহেব যখন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী তখন খৃষ্টধর্ম্ম সত্য হইলেও হইতে পারে"। এই সমস্ত ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে তিনি যে বিশেষ লোকপ্রিয় ছিলেন তাহা স্বতই উপলব্ধি হয়। ভারতীয় ঋষিজনোচিত উদার আকৃতি অবলোকন করিয়া বহু কৃতবিদ্য পুরুষই তাঁহাকে ঋষি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন*। বাস্তবিক তাঁহার উন্নত চরিত্র এবং সত্যপ্রিয়তা ঋষিজনোচিত ছিল বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না। আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সত্য-প্রিয়তা সম্বন্ধে একটী গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। উহা এই:—কাউয়েল যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন সিপাহী বিদ্রোহ উপলক্ষ্যে কলেজ সহরের অন্য কোন অংশস্থিত তিনটী বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। একদা উহারই একটী বাটীতে অগ্রে সোপান আরোহণ ব্যাপার লইয়া ছাত্রদের মধ্যে একটী খণ্ড যুদ্ধ হয়। আচার্য্য শাস্ত্রী মহোদয়ও যোদ্ধৃবর্গের একজন ছিলেন। অচিরাৎ যুদ্ধবার্ত্তা কাউয়েলের কর্ণগোচর হইল, তিনি শাস্ত্রী মহাশয়দের শ্রেণীতে উপস্থিত হইয়া গম্ভীর কণ্ঠে যোদ্ধৃদের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন; কেহই উত্তর দিলনা, এইরূপে দুই তিন বার জিজ্ঞাসার পরও যখন কেহই উত্তর দিলনা তখন শাস্ত্রী মহাশয় আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, তিনি নিজ নাম প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। কাউয়েল তাঁহার সত্যপ্রিয়তায় মুগ্ধ হইয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন যে "যুদ্ধ সাহসের কার্য্য সন্দেহ নাই, কিন্তু সত্যকথন অধিকতর সাহসের পরিচায়ক"।

ভারতবাসীর সমাজসংস্কার বিষয়ে কাউয়েল উদার মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার একটী পত্রে জানা যায় যে তিনি তাঁহার কোন আত্মীয়ার পত্রে, বিলাতে পাঠার্থ দুইজন ভারতীয় রাজার আগমনসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত খুসী হইয়াছেন এবং প্রত্যুত্তরে লিখিতেছেন যে, "আমি যখন ভারতে ছিলাম তখন হিন্দুর পক্ষে কালাপানি উত্তীর্ণ হওয়া বিশেষ পাপ বলিয়া উক্ত হইত, এক্ষণে দুই জন হিন্দু রাজার সমুদ্রপারে আগমনসংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম"। তদীয় ছাত্রগণের প্রতি তাঁহার ভালবাসা এতদূর প্রবল ছিল যে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যখন কেম্ব্রিজে অবস্থান করিতেছিলেন তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য কাউয়েল জলবায়ুর বৈপরীত্য সত্বেও আগ্রহান্বিত চিত্তে আগমন করেন এবং দুইজনে কথোপকথনে অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত করেন।

৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিতেন যে কাউয়েল যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছুটীর পর ছাত্রগণের মধ্য দিয়া তাঁহাদের অনেকের প্রশ্নের সমাধান করিতে করিতে চলিয়া যাইতেন তখন সে একটী দর্শনীয় ব্যাপার ছিল; সেরূপ দৃশ্য এখন কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

ছাত্রগণের প্রতি তাঁহার প্রীতি এতাদৃশ প্রবল ছিল যে একবার পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয় বঙ্গভাষায় একটী ভারতীয় ইতিহাস পুস্তক প্রণয়ন করিয়া উহা কাউয়েলকে দেখিতে বলেন। কাউয়েল তখনও বাঙলা ভাষা শিখেন নাই; তথাপি একজন দোভাষীর সাহায্যে উহা উত্তমরূপে বুঝিয়া লন এবং কেবল এইখানেই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু যখন ইহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় তখন যাহাতে উহা স্কুলের পাঠ্যপুস্তকরূপে গণ্য হয় সেজন্যও বিশেষ চেষ্টা করিয়া অবশেষে কৃতকার্য্য হন। উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ই এক স্থানে বলিয়াছেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজে সুসম্বদ্ধ ইতিহাস-পাঠপ্রণালী কাউয়েলের দ্বারাই প্রথম প্রচলিত হয়।

কাউয়েল কদাচ আত্মপ্রশংসা শ্রবণ করিতে পারিতেন না, কেহ কখনও তাঁহার ন্যায্য প্রশংসা করিলেও তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। কাউয়েল বলিতেন তাঁহার জীবনের ব্রত দুইটী, একটী অধ্যয়ন ও অপরটী অধ্যাপনা।

* He had the look of a veritable Indian "Rishi"—(a part of K. C. Roy's letter, Cowell's life Page 441)

* 'A Rishi has come to us' " (Pandit Shibnath Sastri's letter, Cowell's life Page 444)

তিনি যথার্থই আপনার জীবনের ব্রতোদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন, বলিতে পারা যায়।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষ হইতে কাউয়েল পীড়িত হইয়া পড়েন; ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে উক্ত পীড়া কঠিন আকার ধারণ করে। অবশেষে উক্ত মাসের ৯ই তারিখে তিনি আত্মীয়-পর সকলকেই প্রগাঢ় দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার চিরপ্রিয় নীরব ব্র্যামফোর্ড পল্লীতে তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্মিণীর পার্শে তাঁহার নশ্বর দেহ সমাহিত হয়। কাউয়েলের মৃত্যুতে ইংলণ্ড যে অমূল্য রত্নকে হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহার স্থান কখনও পূর্ণ হইবে কি না জানি না। কাউয়েলের নশ্বর দেহ বিনষ্ট হইয়াছে কিন্তু তাঁহার কল্পস্থায়ী গুণগরিমা এখনও সমভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যতদিন ইংরাজী সাহিত্য পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন তাঁহার ভারতীয় ও পারস্য জ্ঞানোদ্যানের আহৃত প্রসূনাবলী অম্লানভাবে অবস্থান করিবে এবং গন্ধবাহী সমীরণ যেমন দিকে দিকে উল্লাস সৃষ্টি করিয়া প্রবাহিত হয় তদ্রূপ প্রাচ্য-কুসুম-সুবাস-বাহী কাউয়েল ধরণীর প্রতি দিকে অভিনন্দিত হইবেন।

ব্রহ্ম-সংস্পর্শ।

(২)

(শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য)

স্পর্শের এক দিকে যেমন মঙ্গল, অপর দিকে তেমনই অমঙ্গলও আছে। স্পর্শে জীব বাঁচেও বটে, আবার মরেও বটে। আরোগ্যকর ঔষধের স্পর্শে কত শত কঠিন পীড়ার উপশম হয়, আবার বিষাক্ত ঔষধের স্পর্শ, বিষাক্ত বৃক্ষ-লতাদির স্পর্শে, সর্পের ন্যায় বিষাক্ত জন্তুর স্পর্শে সুস্থকায় বলিষ্ঠ জীব জীর্ণ হইয়া পড়ে—মরিয়া যায়। কতিপয় রোগ আছে, যাহা স্পর্শের জন্য অপরে সংক্রামিত হয়। লোকে পিতামাতা ও সাধু গুরুজনের উচ্ছিষ্ট খাইয়া নিজেকে পবিত্র ও তৃপ্ত মনে করে, কিন্তু রুগ্ন ও অসাধুভাবাপন্ন মানবের উচ্ছিষ্টে রুগ্ন ও অসাধু হইয়া যায়। এই জন্য আর্য্যসন্তান যাহার তাহার উচ্ছিষ্ট অন্নাদি ভোজন করেন না এবং আহারীয় বস্তু যাহাতে যে সে স্পর্শ না করে, তাহার জন্য সর্ব্বদা সাবধান থাকেন। মাতা, ভগ্নী বা স্ত্রী ও কন্যাদির রন্ধনে কত যত্ন, আদর ও পবিত্রতা বিরাজ করে; এবং বেতনভোগী দাস দাসী বা দোকানদারদিগের রন্ধনে কত অযত্ন, অনাদর ও মলিনতা মিশাইয়া থাকে। যদি তুমি সুস্থ ও সবল থাকিতে চাও, তবে যাহা তাহা স্পর্শ করিও না, যাহার তাহার হস্তে অন্ন-জল গ্রহণ করিও না এবং যাহার তাহার সহিত এক শয্যায় উপবেশন ও শয়ন করিও না। পবিত্র অন্ন জল আহার-পানে মনও পবিত্র হয়। আমি জানি, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই সব কারণেই স্বপাকে আহার করিতেন। কিন্তু আমরা যদি তপস্যাবলে সর্ব্বদাই পরব্রহ্মকে স্পর্শ করিয়া থাকিতে পারি, তাহা হইলে আর অন্য জীবের স্পর্শ হইতে আমাদের কোনই ভয় থাকে না। মাতৃক্রোড় স্পর্শ করিয়া থাকিলে শিশু যেমন অন্ধকারকে ভয় করে না, ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী কাহাকেও গ্রাহ্য করে না, তেমনই সেই পরম মাতা জগজ্জননীর অঙ্ক স্পর্শ করিয়া থাকিলে আমরাও ত্রিজগতে অপর কাহাকেও ভয় করি না। এই জন্যই অগ্নিমুখে, সমুদ্রগর্ভে, বিষপানে এবং ঐ প্রকার অন্য ভয়ঙ্কর শাস্তিতে সাধুভক্তগণ প্রহ্লাদের ন্যায় অমর, অজেয় ও নির্ভয় থাকেন এবং সজোরে অত্যাচারকারীদিগকে বলেন, "সেই ভয়াপহারী অনন্ত ভগবান কাছে থাকিতে অপর ভয়ের সম্ভাবনা কোথায়?"

শব্দ আসিয়া যতটুকু করিল, স্পর্শ আসিয়া তাহার উপরে আরও একটু অধিক করিল। এই সৃষ্টি একটী দেবতাতে গঠিত নহে, কিন্তু শব্দ স্পর্শ ও রূপ প্রভৃতি পর পর পাঁচটী দেবতা কর্ত্তৃক বর্ত্তমান আকারে আকারিত হইয়াছে। খং-বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ-পৃথিবীময় এই সৃষ্টি শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধের সমাবেশে ও স্থূল বিকাশে অভ্যুদিত হইয়াছে। এই পঞ্চ তন্মাত্রই পঞ্চ দেবতা। ইঁহাদের মধ্যেই "তং দেবতানাম্ পরমঞ্চ দৈবতম্" বিরাজ করিতেছেন। আজ যখন স্পর্শদেবতারই পূজা করিতেছি, তখন আর অপর দেবতাদিগের কথা বলিব না। যখন একটীর সঙ্গে আর একটী মিশিয়া যায়, তখন দুই জনেরই স্বাতন্ত্র্য লোপ পাইয়া অন্য একটী অভিনব পদার্থ উৎপাদন করে। এখন দেখ মিলন কেমন মিষ্ট, কেমন অভিনব! পুংকেশর ও গর্ভকেশরের সংস্পর্শে বা সম্মিলনে কেমন অমৃতপূর্ণ ফলের সৃষ্টি হয়। সাধক! যদি এ জগতে কোন মধুর ফল আকাঙ্ক্ষা কর তবে আপনাকে আর স্বতন্ত্র রাখিও না, কিন্তু সদ্‌গুণ বিশিষ্ট আর একটীর সহিত মিশিয়া যাও। এই মিশামিশি ছোঁয়া-ছুঁয়িতেই ফল-ফুলের বিকাশ, ও সমগ্র জীবের জন্ম। এই মিশামিশিতেই সাধুভক্তগণ ব্রহ্মকে নিত্যই নূতন দেখেন। বোধ হয় এই জন্যই ছোঁয়াছুঁয়ি করিবার আশায় এই সৃষ্টি যেন একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। আকাশের গ্রহ তারা পরস্পরকে ছুঁইবার জন্য কতই না ব্যস্ত হইয়া ব্যোমে ব্যোমে ছুটাছুটি করিতেছে। এমন উদ্দাম ছুটাছুটি আর কোথাও নাই। সমুদ্রকে স্পর্শ করিবার জন্য নদ-নদী কতই না বেগে তর তর করিয়া বহিতেছে। পাখী আকাশকে ছুঁইবার

জন্তু যেন উধাও হইয়া প্রাণপণে উর্দ্ধে উঠিতেছে; এবং পৃথিবী হইতে স্বর্গকে ছুঁইবার জন্য, ইহলোক হইতে পরলোককে স্পর্শ করিবার জন্য, মানব হইয়া দেবতাকে ধরিবার জন্য, যোগী ভক্ত কর্ম্মী জ্ঞানী ঋষি মহর্ষি দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি সকলেই যেন উর্দ্ধবাহু হইয়া অনন্তের পথে অবিশ্রান্ত দৌড়াইতেছেন।

শব্দে মানুষ মোহিত হয়, কিন্তু স্পর্শে একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে। প্রেমিক বন্ধু বন্ধুকে ছুঁইবার জন্য কতই না আগ্রহান্বিত—সদ্যপ্রসূত পুত্রটীকে কোলে তুলিবার জন্য প্রসূতি কতই না ত্বরান্বিতা—আকাশের চাঁদকে একবার ছুঁইবার জন্য ক্ষুদ্র শিশুর কতই না সরল হস্তপ্রসারণ—ভবকাণ্ডারীর চরণতরীকে স্পর্শ করিবার জন্য মুমুক্ষু মানবের কতই না ব্যাকুল প্রার্থনা! কি জানি, স্পর্শের ভিতরে কি দৈবশক্তি লুক্কায়িত আছে যে একের স্পর্শে অপরে একেবারে আত্মহারা ও উন্মাদ হইয়া যায়! তুমি যতই কেন আমাকে ভালবাস না, যতই কেন প্রেমনয়নে আমার পানে তাকাও না, একবার প্রেমভরে স্পর্শ না করিলে আমার প্রাণ জুড়ায় না—একবার তোমার পদ্ম-হস্ত বুলাইয়া না দিলে আমার গাত্রজ্বালা কমে না—একবার মস্তকে হাত না দিলে প্রাণ কিছুতেই শান্তি লাভ করে না। ঔষধে যাহা না হয়, প্রেম-ভরা প্রাণভরা শুশ্রূষায় তাহা হইয়া থাকে। পদসেবায় পায়ের বেদনা কমে, বুকে চাপিয়া ধরিলে হৃৎকম্প কমে, চক্ষে হাত বুলাইয়া দিলে দিব্যদৃষ্টি ফুটে। ইহা কে পারেন? মা পারেন, বন্ধু পারেন, আর সেই জগন্মাতা জগজ্জননী পারেন। মায়ের স্পর্শ মলয়মারুতের স্পর্শ অপেক্ষাও সুমিষ্ট—প্রিয় সখা-সখীর স্পর্শ বসন্তের কোকিল-কাকলীর ন্যায় স্বপ্নময়—সাধু ভক্তের সংস্পর্শ শরতের প্রতিপদের চন্দ্রকলার ন্যায় আশাপ্রদ, এবং জগজ্জননীর স্পর্শ ভূতলে জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিত স্বর্গের ন্যায় আনন্দময়। স্পর্শ না করিলে কাহাকেও আদর করা সম্পূর্ণ হয় না। পোষিত গোবৎস বা মৃগশিশুকে নাম ধরিয়া ডাক, তত বুঝিতে পারিবে না—কিন্তু গায়ে হাত বুলাইয়া দেও, সে তোমার আদর সাদরে অনুভব করিবে। ভগবান তাঁহার অনুগত ভক্তজনের গায়ে হাত বুলাইয়া দেন বলিয়াই ভক্ত ক্রুশে বিদ্ধ হইলেও বিদ্ধকারীদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন, অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলেও নিক্ষেপকারী-দিগকে আলিঙ্গন করেন, এবং বাইশ বাজারে নিষ্ঠুরভাবে প্রহৃত হইলেও প্রহারকারিগণকে হাস্যমুখে অভিবাদন করেন। কার সাধ্য ভক্তকে কষ্ট দেয়? এ জগতে এমন দুরাত্মা দানব কে আছে যে হরিভক্তের প্রাণে যাতনা দিতে পারে? ভগবান যাহার সর্ব্ব দেহে বর্ম্ম স্বরূপ হইয়া আছেন, সে ভক্ত দুরন্ত সংসার-রণভূমিতে অজেয়, অবধ্য ও অমর। শুনিয়াছি গণ্ডারের চর্ম্ম কোনও অস্ত্রেই বিদ্ধ হয় না, তেমনই হরিভক্তের চর্ম্মও পার্থিব কোন শাণিত শরেই বিদ্ধ হয় না। কেননা ভক্তের 'শরবৎ' আত্মাই লক্ষ্যরূপী ব্রহ্মের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া 'তন্ময়ঃ' হইয়া যায়। তাই ব্রহ্মের গায়ে হাত না দিলে ভক্তের গায়ে সে হাত ঠেকে না; ব্রহ্মকে না মারিলে ভক্তকে মারা যায় না।

শত্রুর গায়ে শত্রুতা ভুলিয়া আদর করিয়া হাত দাও—তাহার রোগশয্যায় বসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গের সেবা কর, দেখিবে সে আর তোমার শত্রু থাকিবে না—দেখিতে দেখিতে পরম মিত্ররূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। মানুষকে যদি ফিরাইতে চাও—অসুরকে যদি দেবতা করিতে চাও—অসাধুকে যদি সাধু গড়িতে চাও, তবে স্নেহভরে প্রেমভরে তাহার গায়ে হাত বুলাও—বেদনা ঝাড়িয়া দেও, অশ্রু মুছাইয়া দেও। সস্নেহে সপ্রেমে গায়ে হাত বুলাইবার লোক এ জগতে কয় জন পাওয়া যায়? বেদনা দূর করিবার, অশ্রু মুছাইবার বন্ধু কাহার কয় জন আছে? স্নেহ মাখা হাত গায়ে পড়ে না বলিয়াই মাতৃহারা শিশু অত মলিন—প্রেমপূর্ণ কণ্ঠালিঙ্গন পায় না বলিয়াই পত্নীহারা দুর্ভাগা মানব অত রুক্ষ শুষ্ক ও কঠোর। এই জন্যই কৃষ্ণের কাল রূপ যশোদার কোলে বড়ই খুলিয়াছিল, এবং শিবের বামে সতী ও রামের পাশে সীতা বড়ই সাজিয়াছিল। যশোদা না থাকিলে কেহই বনের রাখালবালক কৃষ্ণকে অত শ্রীমান্ করিয়া তুলিতে পারিত না, সতী না থাকিলে শিবকে কেহই শ্মশান হইতে কৈলাসধামে লইয়া যাইতে পারিত না, সীতা না থাকিলে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসের কঠোর যাতনা রামচন্দ্র কখনই এত হাস্যমুখে সহ্য করিতে পারিতেন না। স্নেহময়ী জননী এবং পতিব্রতা সতী স্ত্রী এই উভয়েই মানবজাতির কান্তি, পুষ্টি, তৃপ্তি ও শান্তি।

এই স্পর্শদেবতা বায়ুরূপে জগতের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন, তাই ইহাঁর নাম জগৎপ্রাণ। প্রকৃতির প্রাণের স্পন্দন এই বায়ুতেই অনুভূত হইয়া থাকে। মানবের হৃদয়যন্ত্রের স্পন্দনও এই স্পর্শেই অনুভূত হইয়া থাকে। রোগীর গাত্রে হাত দিয়া তাহার নাড়ী ধরিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস পরীক্ষা করিয়া বিজ্ঞানবিদ্ চিকিৎসক তাহার জ্বরের উত্তাপের পরিমাণ, প্রাণনক্রিয়ার গতি প্রভৃতি নিরূপণ করেন। স্পর্শের দ্বারা দর্শনও করা যায়; গায়ে হাত দিয়া উত্তাপ দেখি, নাড়ী ধরিয়া জ্বরের বেগ দেখি। প্রাণের জ্বালাও এই স্পর্শের সাহায্যে জানা যায়। বিরহীর তপ্ত নিঃশ্বাস কতই না

উত্তপ্ত ও আলোময়! বাণী বা শব্দ কেবলমাত্র কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া থাকে, কিন্তু স্পর্শ সর্ব্বাঙ্গের অসংখ্য অণু ছিদ্রপথে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের অন্তস্তলে আঘাত করে। স্পর্শ জীবের জীবনকাঠি ও মরণকাঠি। আমি তোমাকে বিষ মাখাইয়া মারিতেও পারি, আবার ঔষধের প্রলেপ দিয়া মরণ হইতে ফিরাইতেও পারি। এমন জীবন ও মরণের বন্ধুকে আমরা কখনই উপেক্ষা করিতে পারি না—এ দেবতার যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা ও পূজা করিতেই হইবে।

এই স্পর্শে নাকি মানীর মান যায়, ব্রাহ্মণ অশুচি হয়, ছোঁয়াছুঁয়িতে জাতি যায়। ভগবান যাদের স্পর্শ করেন, তাদের জাতি যায়, কুল যায়, মান যায়; শব্দ বা বাণী শ্রবণে কাহারও জাতি যায় না, কিন্তু স্পর্শ বা ছোঁয়াছুঁয়িতে লোকের জাতি যায়। ব্রহ্মের কোনও জাতি নাই; তাই তিনি বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, নানক ও গৌরাঙ্গের মুখ দিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে মানব-জাতির কোন জাতি নাই—তাহারা সকলেই এক জগৎপিতার সন্তান! নদীয়ায় গৌরাঙ্গদেব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান যখন তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন, আলিঙ্গন করিলেন, তখন তাঁহার চৈতন্য হইল, তখন তিনি ঘোষণা করিলেন যে মানবের জাতি নাই। তাঁহার সংস্পর্শে যাঁহারা আসিলেন তাঁহাদের সকলেরই জাতি গেল। শত শত ব্রাহ্মণ ও শূদ্র তাঁহার দলভুক্ত হইয়া আপনাদের পূর্ব্ব পরিচয় ভুলিয়া "দাস" বলিয়া পরিচিত হইলেন। মহামহোপাধ্যায় সার্ব্বভৌম পণ্ডিতও দাসখতে নাম লিখাইলেন। গৌরাঙ্গ পরশে লোকের জাতি গেল, মান-সম্ভ্রম গেল, অভিমান পলায়ন করিল। কেবল শ্রীক্ষেত্র নহে, কিন্তু সমগ্র বিশাল ভারতক্ষেত্রে, কেবল শ্রীপুরীতে নহে কিন্তু ভারতের সকল প্রধান পুরীতে আজ গৌরাঙ্গের এই 'স্পর্শ' বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। তাই ছোঁয়াছুঁয়িতে বর্ত্তমান যুগে জাতি রক্ষা করা দায় ও সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে।

ভগবান যখন দূরে থাকেন তখন তিনি আহ্বান করেন, শব্দ উচ্চারণ করিয়া ডাকেন; কিন্তু তিনি যখন নিকটে অতি নিকটে আসেন, তখনই আমাকে স্পর্শ করেন, ছুঁইয়া ফেলেন, আলিঙ্গন করেন। শব্দে যিনি কেবল-মাত্র কর্ণে, স্পর্শে তিনি সর্ব্বাঙ্গে। ভগবানের সংস্পর্শ আমার সর্ব্বাঙ্গে! ভগবান যখন জীবকে ধরেন, স্পর্শ করেন, তখন দেখিতে দেখিতে জীব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহার সর্ব্বাঙ্গে দিব্যশ্রীর বিকাশ দেখা যায়। প্রাচীন ভক্তের মুখে একটী গান শুনিয়াছিলাম,—"ওটা শিব নয় মায়ের পদতলে। এটা মিথ্যা কথা লোকে বলে। দৈত্য বেটা রণে পড়ে, মা গিয়ে তার ঘাড়ে চড়ে, মায়ের পদস্পর্শে দানব-দেহ শিবরূপ হয় রণস্থলে।" জীব যতই কেন মলিন থাকুক না, ব্রহ্ম যখন তাহাকে স্পর্শ করিয়া আছেন, তখন তাহাকে পরিবর্ত্তিত হইতেই হইবে। একদিন না একদিন তাহার শ্রী ফিরিয়া যাইবেই যাইবে। তুমি যতই কেন আপনার জাতি-কুল বজায় রাখিবার চেষ্টা কর না, একদিন না একদিন হরি তোমাকে স্পর্শ করিয়া তোমার জাতি-কুল নষ্ট করিয়া দিবেনই দিবেন। তুমি যখন ক্ষুদ্র দেহপিঞ্জর ভাঙ্গিয়া অনন্ত গগনপথে উড়িবে, তখন তোমার জাতি থাকিবে না—কুল থাকিবে না, নাম-রূপ উপাধি কিছুই থাকিবে না। ইহা মাটির দেশ, পৃথিবী মাটিতে নির্ম্মিত, এখানে মাটিরই বেশী আদর। যার যত মাটি আছে, সে তত বড়লোক। সে মূর্খ চরিত্রহীন পাষণ্ড হইলেও সংসারের কাছে দেবতার ন্যায় পূজা প্রাপ্ত হয়। এদেশে আসিয়া সকলেই মাটি হইয়া যায়। আমরা কিন্তু মুখে খাঁটি জিনিসের আদর করিলেও মাটিকেই ভাল চিনি। খাঁটিকে চিনিবার ইচ্ছা ও শক্তি আমাদের বড়ই কম। কিন্তু ব্রহ্মস্পর্শে একদিন আমাদের মাটির রূপ বদলাইয়া যাইবে—সব কাল্পনিক রূপ চলিয়া যাইবে। আমরা দানব হইয়াও ব্রহ্মস্পর্শে দিব্যভাব ধারণ করিব—শিবরূপ ধারণ করিব। আজ যিনি ধনমদে মত্ত, ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্যে আত্মবিস্মৃত, অন্তঃসারশূন্য তোষা-মোদকারিগণে পরিবৃত, তিনিও একদিন ব্রহ্মস্পর্শগুণে রাজপুত্র গৌতমের ন্যায় দীনহীন বেশে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে আপনার ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

ক্ষুদ্র বীজ ফল-পুষ্প-শোভিত বিশাল বৃক্ষকে বীজ-রূপেই বুকে করিয়া জন্ম গ্রহণ করে বলিয়াই তাহার সুন্দর অভিব্যক্তি যেমন অপরিহার্য্য, তেমনই আমরা সূক্ষ্ম শব্দ-স্পর্শাদিরূপে ভূমা পরব্রহ্মকে বুকে করিয়া জন্মিয়াছি বলিয়াই আমাদের ক্রমোন্নতি—ক্রমবিকাশ—ইহলোক পরলোক ছাড়াইয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইবেই হইবে। সূর্য্যোদয়কে চাপিয়া রাখা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তোমার আমার উন্নতিকে—মাঙ্গলিক অভিব্যক্তিকে—দেবত্বের বিকাশকে চাপিয়া রাখিতে পারে এমন দুর্জ্জয় শক্তি এ বিশ্বে আজিও সৃষ্টি হয় নাই। আমরা ব্রহ্মসন্তান, তুমি আমাদের সহস্রবার ক্ষুদ্র মনে করিয়া ঘৃণা করিলেও আমরা একদিন মাটি ঠেলিয়া গাছ-পাথর সরাইয়া আকাশ ভেদিয়া ব্রহ্মধামে গিয়া উপনীত হইবই হইব। রাজসিংহাসনবিহারিণী রাজ-আদরে গরবিনী হাবভাবময়ী সুরুচির সন্তান 'উত্তমকে' পশ্চাতে ফেলিয়া কাননবাসিনী উটজসঞ্চারিণী জন্ম-দুঃখিনী সুনীতিদেবীর দীন হীন পুত্র 'ধ্রুব' নিশ্চয়ই

একদিন দেব-মানববন্দনীয় হইয়া ধ্রুবলোকে স্থান পাইবেই পাইবে। আজ আমরা বৃক্ষলতা, নদ-নদী চন্দ্র-সূর্য্যাদির অধীন হইয়া উহাদিগকে প্রভু বলিয়া মানি; কিন্তু আমাদের এমন শুভদিন আসিবেই আসিবে যে দিন এ বিশ্বের সমুদয় বৃক্ষলতা আমাদের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি ঢালিয়া দিবে—সমস্ত নদ-নদী আমাদের পাদপদ্ম ধৌত করিয়া দিবে—সমস্ত গ্রহ-তারকা আমাদের জয়-গান করিবে এবং সমগ্র ভূমণ্ডল আমাদিগকে সাদরে আলিঙ্গন দিবে। এ কথা সত্য যে আজ আমরা বড়ই দুর্ব্বল, কিন্তু দেখ দেখ আমাদের মধ্যে সেই দুর্ব্বলের বল প্রতিষ্ঠিত আছেন। একথা সত্য যে আমরা বড়ই মলিন, কিন্তু দেখ দেখ আমাদের মধ্যে সেই আদিত্যবর্ণ চির জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ চির উদিত হইয়া আছেন। একথা সত্য যে আজ আমরা বড়ই ক্ষুদ্র, কিন্তু দেখ দেখ আমাদের মধ্যে সেই মহতো মহীয়ান চিরবিরাজ করিতেছেন। সুতরাং আমাদের আর ভয় নাই—আমাদের আর বিপদ নাই। আমাদের ক্রমোন্নতি একান্তই অপরিহার্য্য! আমরা যখন বিশ্ববীজকে বীজ-রূপে বক্ষে লইয়া জন্মিয়াছি—তখন মাতৃক্রোড়ে শিশুর ন্যায় ক্রমোন্নতির সুদর্শনচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে যে অমৃতের পথে—অনন্তের পথে, অভয়ের পথে দিনে দিনে সচ্চিদানন্দের আনন্দ ধামে গিয়া পৌঁছিব তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। আজ আমরা এই মাটির দেশে মাটির পথে ধূলায় লুটাইতে লুটাইতে সাংসারিক সুখের আশায় ব্যাকুলভাবে "স্বর্ণমৃগের" পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে শত লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছি, কিন্তু নিশ্চয়ই জানিও চিরদিন আমাদের এ দুর্দ্দশা থাকিবে না, ব্রহ্মসংস্পর্শে ব্রহ্মোপাসনাবলে ব্রহ্মগুণগানে আমরা এই মাটির দেশকে মধুময় দর্শন করিব এবং "ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে" গাইতে গাইতে ব্রহ্মনামের নিশান উড়াইয়া সাধুভক্তগণের সঙ্গে মিশিয়া চিদানন্দপুরে গমন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইব।

বঙ্গভাষার সহিত দ্রাবিড় ভাষার সৌসাদৃশ্য।

(শ্রীঅমিয়ময় দাস, বি-এ)

বৈদিক যুগের পূর্ব্বে (১৫০০ খৃঃ পূঃ) আর্য্যগণ যখন প্রথম ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের আচার-ব্যবহার হেলন্, ইটালী, কেল্‌ট, জার্ম্মান এবং স্লাভ-দেশীয় পূর্ব্বপুরুষগণের আচার-ব্যবহারের ন্যায় ছিল। তাঁহাদের প্রভাব তখনও এদেশে তেমন ভাবে সঞ্চারিত হয় নাই। তখন আদিম দ্রাবিড়দিগের ভাষা, ধর্ম্ম, শিল্প প্রভৃতি উন্নত হইতেছিল। পরে আর্য্যগণ আসিয়া তাঁহাদের ভাব প্রচার করিতে লাগিলেন; এবং এই সময় হইতে দ্রাবিড়-দিগের অনেক কথা আর্য্যভাষার মধ্যে আসিয়াছিল দ্রাবিড়-দিগের বহু দেব-দেবীর নাম, কাহিনী প্রভৃতি আর্য্যেরা গ্রহণ করেন; এমন কি অনেক সময়ে তাহাদের মতবাদকেও মানিয়া লইতেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে,—আত্মার যোনিভ্রমণ (Transmigration of soul) সম্বন্ধে ঋগ্বেদে বিশেষ উল্লেখ না থাকিলেও, আর্য্যেরা দ্রাবিড়দিগের নিকট ইহা গ্রহণ করেন। দ্রাবিড়দিগের দেব-দেবীর নামও যে আর্য্যেরা ব্যবহার করিতেন তাহার কতক প্রমাণ পাওয়া যায়; দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, দ্রাবিড়দের পর্ব্বতের দেবতাকে আর্য্যেরা "রুদ্র" (Red God) বলিতেন। এই 'রুদ্রের' নাম তামিল ভাষায় শিবন (লোহিত) এবং শেম্বু (তাম্র); ঐ শব্দদ্বয় হইতেই "শিব" এবং "শম্ভু" শব্দের উৎপত্তি। অতঃপর পৌরা-ণিক যুগে আর্য্যেরা 'রুদ্র' 'শিব' অথবা 'মহাদেব' বলিয়া এক দেবতা আছেন, এই কথা ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

ঋগ্বেদের ভাষা, পদলালিত্য, বাক্যবিন্যাস আর্য্য-দিগের নিজস্ব; কিন্তু কতকগুলি শব্দের উপর যে অজ্ঞাত-সারে দ্রাবিড়শব্দের প্রভাব আসিয়াছে তাহা বেশ প্রতীয়মান হয়। ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত শব্দগুলি দ্রাবিড়-শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন। যথা:—অনু, কপি, পুষ্প, পুষ্কর, নানা (অনেক), কুট (কুটীর), কলা (কলাবিদ্যা), কাল (সময়), নীল, ফল, বিল (গর্ত্ত), ময়ূর, নীহার, বীজ, রূপ, সায়ং, কুণ্ড, পূজন ইত্যাদি বহু শব্দ দ্রাবিড় হইতে গৃহীত।

যতই আর্য্যগণ ইহাদের সহিত মিশিতে লাগিলেন ততই পরস্পরের মধ্যে শব্দের আদানপ্রদান হইতে লাগিল। বৈদিক যুগের পরেও আর্য্যভাষায় আরও অনেক দ্রাবিড় শব্দ পাওয়া যায়। যথা:—অটবী, অর্ক (এক প্রকার ফুল) সোনা, তণ্ডুল, তিল, আড়ম্বর, মর্কট, বলক্ষ (শ্বেত বর্ণ), শব, কুলাল (কুম্ভকার) ইত্যাদি।

স্বর, বাক্যযোজনা, পদবিন্যাস, শব্দার্থ প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে দ্রাবিড়ভাষার সহিত বঙ্গভাষার অনেক মিল আছে।

বঙ্গভাষায় যেমন প্রাণ, স্নেহ, রত্ন ইত্যাদি না বলিয়া অনেক সময়ে দীর্ঘ উচ্চারণে পরাণ, সিনেহ, রতন বলি, সেই প্রকার যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণকে ভাঙ্গিয়া স্বরবর্ণের সহিত মিলিত করিয়া দ্রাবিড় ভাষাতেও দীর্ঘ শব্দের উচ্চারণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, তামিল:—পিরাম্মন (ব্রাহ্মণ); কন্নড়:—বরামন (ব্রাহ্মণ); তামিল:—

শিনেগন (স্নেহ) শদিরন (চন্দ্র), কিরুট্টিণন (কৃষ্ণ), মিত্তিরন (মিত্র)।

বঙ্গভাষায় যেমন উচ্চারণের সুবিধার নিমিত্ত বড় শব্দ হইতে ছোট শব্দ—যথা, মানব হইতে মান, সর্ব্ব হইতে সব, কক্ষ হইতে কো, স্থান হইতে ঠাঁই, পার্শ্ব হইতে পাশ ইত্যাদি ব্যবহার করি, সেই প্রকার দ্রাবিড় ভাষাতেও দেখিতে পাই।

বঙ্গভাষায় যেমন 'হইতে', 'থাকিয়া', 'লাগিয়া', 'দিয়া' প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা পদ রচনা করি, সেইরূপ তামিল ভাষায় 'ইনরু' 'মিনরু' প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা পদ গঠিত হয়। যথা, বলিয়া—তামিল :—এনরু; কন্নদ :—এণ্ডু; তেলেগু :—এনি। তাহাকে ছুঁইয়া—তামিল :—অত্তন ওছু; ছুরি লইয়া :—কত্তিয়ৈ কাণ্ডু।

দ্রাবিড় ভাষাতে বঙ্গভাষার মত বিশেষ্য বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। যথা, তামিল :—পন—ন—ইন—কুদম (সোনার বাটী)।

ভাষাপদ্ধতি (Idiom.) দেখিতে গেলে বঙ্গভাষার সহিত দ্রাবিড় ভাষার অনেকটা মিল আছে;—যথা, 'লইয়া আইস' বলিলে 'লও' এবং 'এস' না বুঝিয়া 'আন' বুঝায়, সেই প্রকার তামিল "কোন্দুভা" বলিলে "আন" বুঝায়।

বঙ্গভাষার ন্যায় দ্রাবিড় ভাষায় এক কালে এক-বর্গের শব্দের পর অপরবর্গের প্রতিশব্দ উচ্চারণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, ঘোড়া-টোড়া (তামিল :—কুদিরাই-কিদিরাই, তেলেগু :—গুররামু-গিররামু)। জল-টল (তামিল :—তনণীর-কিনণীর; কন্নদ :—নীরু-গীরু)।

বঙ্গ ও দ্রাবিড় ভাষায় অনেক সময়ে বাক্যের মধ্যে ক্রিয়া ব্যবহার করিতে হয় না; যথা—এটা আমাদের বাড়ী (কন্নদ :—ইহু নম্ম মনে); মানুষটী ভাল। তামিল :—মনীদন নল্লভন)।

নিম্নলিখিত শব্দের তালিকা হইতে ইহা সুস্পষ্ট বিবেচিত হয় যে, বঙ্গভাষার সহিত তামিলভাষার বেশ সৌসাদৃশ্য আছে।

তামিল ও তেলেগু ভাষায় 'আকালি' অর্থে ক্ষুধা বুঝায়; ইহা হইতে বাংলা আকাল (দুর্ভিক্ষ) শব্দ আসিয়াছে। তামিল :—কল (প্রস্তর) = বাংলা 'খল' (সংস্কৃত :—উদূখল) তামিল :—কাই-কারি (শাক-শব্জী) = বাংলা 'তরকারি'। তামিল :—কুদ (দোকান) = বাঙ্গলা 'কোঁদা-কুঁদি'। তামিল :—খাড়াল (সাগর) = বাংলা 'খাড়ি'। কেহ কেহ বঙ্গোপসাগরকে 'খাড়ি' বলেন এবং অনেকে বাঙ্গলায় 'খাড়াল' অর্থে নদীর ছোট 'খালকে' বুঝেন। তামিল :—খুট্‌টা (তোলা) = বাংলা 'খোঁটা' (যথা—পায়রা ধান খুঁটে খায়)। তেলেগু :—গাত্রাগোল (গোলমাল) = বাংলা 'গণ্ডগোল'। তামিল :—গোন্দু (আঠা) = বাংলা 'গঁদ'। তেলেগু :—চক্কনি (সুন্দর) = বাংলা 'চিকণ'।

তামিল :—চোন্নাম (কলাই) = বাংলা 'ছোলা' সংস্কৃত চণক। তেলেগু :—তালা (মাথা); তামিল :—তালৈ (মস্তক) = বাংলা 'তেলো'।

তেলেগু :—পালু; তামিল :— পাল (দুগ্ধ) = বাংলা 'পালান' (গাভীর স্তন)।

তেলেগু :—পট্টু (রেশম), তামিল :—পট্টু (রেশমী কাপড়) = বাংলা 'পাট'।

তামিল :—পিললই (ছোট ছেলে); তেলেগু :—পিললা (ছোট ছেলে) = বাংলা 'ছেলে পিলে' (পূর্ব্ববঙ্গে অনেকে ছেলেকে 'পোলা' বলেন)।

তেলেগু :—পিললি (বেড়াল) = বাংলা 'বিল্লী' বা 'বিলাই' (পূর্ব্ববঙ্গে অনেকে বেরালকে 'বিলাই' বলেন)।

তেলেগু :—বান (বৃষ্টি) = বাংলা 'বন্যা' অর্থে 'বান' শব্দ ব্যবহৃত হয়।*

আদিব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার কার্য্যবিবরণ।

১৫ই ফাল্গুন, ১৩৩৩ সাল।

গত ১৫ই ফাল্গুন (২৭শে ফেব্রুয়ারি) রবিবার প্রাতঃকাল ৯ ঘটিকার সময় ৫৫নং আপার চিৎপুর রোড, আদিব্রাহ্মসমাজ দ্বিতল-গৃহে গত ১১ই ফাল্গুনের বিজ্ঞাপন অনুসারে অধ্যক্ষসভার অধিবেশন হইয়াছিল। নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন :—

১। ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী পি-এইচ ডি;
২। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
৩। „ নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল।
৪। „ ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি. এস-সি।
৬। „ সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।
৭। „ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* এই প্রবন্ধটী নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্যে লিখিত :—
Kannad Dictionary by F. Kittel.
Vedic Grammar by A. A. Macdonell; The History of the Bengali Language by B. C. Mazumdar; The Origin & Development of the Bengali Language by S. K. Chatterji; Comparative Grammar of Dravidian by R. Caldwell.

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবনে এবং সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অধ্যক্ষসভার গত ৯ই আশ্বিনের অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গত কার্ত্তিকসংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়ায় তাহা অধীত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়ালের প্রস্তাবনে এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, বর্ত্তমান ট্রষ্টীগণের নিকট ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি. এস-সি মহাশয়কে অন্যতর ট্রষ্টী করিবার জন্য অনুরোধ করা হোক।

৩। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবনে এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে স্থির হইল যে, আগামী বৎসরের জন্য ডাঃ সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কে আদি-ব্রাহ্মসমাজের সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হোক।

৪। কোম্পানির কাগজ বিক্রয় দ্বারা সমাজের ঋণ-পরিশোধ আলোচিত হইল।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক নিযুক্ত হইবার পর তাঁহারই প্রযত্নে পূর্ব্বাগত প্রায় ১২০০৲ টাকার ঋণ শোধ হইয়া ২৯০০৲ টাকার কোম্পানির কাগজ সংগঠিত হইয়াছিল। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে ভীষণ দুর্মূল্যতার কারণে এবং যথাসময়ে মহর্ষিপ্রদত্ত মাসিক বৃত্তি না পাইবার কারণে পুনরায় সমাজের অনেক টাকা ঋণ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। অবশেষে নিতান্ত বাধ্য হইয়া সম্পাদক মহাশয় হাইকোর্টের অনুমতি লইয়া কোম্পানির কাগজ ভাঙ্গাইয়া তাহার মূল্য ও সুদ হইতে উক্ত ঋণ আংশিক পরিশোধ করিয়াছেন, ইহা অধ্যক্ষগণকে অবগত করান হইল। অধ্যক্ষগণের বিশেষ অনুরোধ এই যে, মহর্ষির ষ্টেটের উইলসূত্রে সমাজের বৃত্তি দিবার ভার যাঁহাদের করে, তাঁহারা সমাজের আনুমানিক ২৬০০৲ টাকা এবং মাসিক ২০০৲ টাকার বৃত্তি যথাসত্বর ও যথা-কালে দিবার ব্যবস্থা করিয়া অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধের এবং কোম্পানির কাগজ পুনর্গঠনে সহায়তা করুন।

৫। মহর্ষিপ্রদত্ত মাসিক বৃত্তি পাইবার প্রচেষ্টা আলোচিত হইল।

সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এস্-সি এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া শান্তিনিকেতনে গিয়া পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তাঁহার কথামত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া অন্যতর ট্রষ্টী শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত, আবার রথীন্দ্র-বাবুর কথামত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বৃত্তির অভাবে সমাজের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হইবার সম্ভাবনা তাঁহাদের সকলকে স্পষ্টভাবে জানান। অবশেষে সুরেন্দ্রবাবুর কথামত রথীন্দ্রবাবুকে একখানি পত্র লেখা হইয়াছে। তাঁহার নিকট হইতে উত্তর আসিলে এবিষয়ে সম্পূর্ণ বিবরণ অধ্যক্ষসভাকে জানান হইবে।

স্থির হইল যে, উত্তরের জন্য এক সপ্তাহ অপেক্ষা করা হউক।

৬। একজন চিত্রকর সমাজের একতলার কতক অংশ ভাড়া লইতে ইচ্ছা করে।

স্থির হইল, চিত্রের জন্য সমাজের কোন অংশ ভাড়া দেওয়া যাইতে পারে না।

৭। শ্রীমতী চন্দ্রাননী মিত্র (৫নং মহামায়া লেন, কালীঘাট) সাহায্য প্রার্থনা করেন।

স্থির হইল, সমাজের অবস্থা স্বচ্ছল হইলে সম্পাদক মহাশয় যথাযোগ্য সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

৮। নূতন অধ্যক্ষনিয়োগের প্রস্তাব আলোচিত হইল।

আজ কয়েক বৎসর হইল বর্ত্তমান অধ্যক্ষগণ নিযুক্ত হইয়াছেন। স্থির হইল, নূতন অধ্যক্ষনিয়োগের যথা-রীতি ব্যবস্থা করা হোক।

৯। শ্রীযুক্ত সিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনে শতকরা ৬½ টাকা সুদে ৩ বৎসরের জন্য ২০০৲ টাকা গচ্ছিত রাখিয়া তাহার রসিদ সম্পাদক মহাশয়ের নামে আদিসমাজের উন্নতিকল্পে দান হিসাবে গচ্ছিত রাখিয়াছেন।

স্থির হইল, এজন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান হোক।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্ব্বক সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক। ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৩৩।	শ্রীউপেন্দ্রনাথ চৌধুরী সভাপতি।

আদিব্রাহ্মসমাজের পরিচালকবর্গ।

(শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি. এস্-সি কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

এদেশে বর্ত্তমানে যে নূতন যুগের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার 'সমন্বয়-যুগ' নামকরণ করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। নব্য ইয়োরোপের জ্ঞানালোকের সহিত বিস্মৃত-প্রায় ভারতীয় প্রাচীন সাধনাকে সমন্বিত করিয়া নবভাবে ফিরাইয়া পাওয়াই এ যুগের বৈশিষ্ট্য। প্রায় শতাব্দী পূর্ব্বে এই সমন্বয়ের সূত্রপাত হইয়াছে। অধুনা বাঙ্গালার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেকগুলি শিক্ষা ও প্রচারকেন্দ্র গড়িয়া

উঠিয়া এই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। কিন্তু আজ হইতে ৯৮ বৎসর পূর্ব্বে দেশের অবস্থা এরূপ ছিল না। সেদিন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সমগ্র বাঙ্গালায় ও নিখিল ভারতভূমিতে এই উদ্দেশ্যে কেবল একটীমাত্র প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিভূমি রচনা করিয়াছিলেন—উহা তাঁহার 'ব্রহ্মসভা'। আজ তাঁহারই প্রভাব অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া নব নব ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতেছে।

১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র বুধবার সন্ধ্যায় কলিকাতা নগরীর যোড়াসাঁকো পল্লীতে চিৎপুর রোডের উপর কমললোচন বসুর ভাড়াবাড়ীতে রামমোহন রায়ের 'ব্রহ্মসভার' প্রথম উদ্বোধন হয়। অতঃপর ৫৫নং আপার চিৎপুর রোডে ব্রহ্মসভার একটী নিজস্ব ভবন নির্ম্মিত হইতে থাকে। ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ এই নবগৃহে ব্রহ্মসভার 'গৃহপ্রবেশ'-উৎসব সম্পন্ন হয়। ১৭৫২ শকের অগ্রহায়ণ মাসে রাজা আপনার অসমাপ্ত কর্ম্মভার ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের কল্যাণ-উদ্দেশ্যে পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের হস্তে ন্যস্ত রাখিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ১৭৬১ শকে পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে যোগ্য পাত্র বুঝিয়া তাঁহারই হস্তে রাজা রামমোহনের 'ন্যাস' প্রত্যর্পণ করেন। এই সময় হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রহ্মসভার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। তদবধি ১৭৮১ শক পর্য্যন্ত এই সভার সহিত বাঙ্গালার তদানীন্তন জ্ঞানী গুণী ও মনীষীবৃন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটে এবং ইহা ধর্ম্ম ও জ্ঞানালোচনার একটী পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। ১৭৬৫ শকের ভাদ্রমাসে এই সভার মুখপত্ররূপে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম জন্মলাভ করে। তদবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ইহার ধারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হইতেছে; কিন্তু যাহার স্মৃতি বুকে লইয়া ইহার জন্ম, সেই তত্ত্ববোধিনী সভা ১৭৮১ শকের ১১ই পৌষ তারিখে আপনার স্বতন্ত্র সত্তা বিলুপ্ত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সহিত একীভূত হইয়া যায়। ইতিমধ্যে রামমোহনের 'ব্রহ্মসভা' ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া 'ব্রাহ্মসভা' 'ব্রাহ্মসমাজ' ও 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ' নাম পরিগ্রহ করে। ১৭৮৮ শকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবল মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়া ঐ শকে কার্ত্তিক মাসে (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর) সমগ্র সমাজটী দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়। নূতন ধারাটী 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নাম গ্রহণ করে; আর পুরাতন মূল ধারাটী তাহার পূর্ব্ব নাম পরিহার করিয়া 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হয়। তদবধি রামমোহনের আদি প্রতিষ্ঠান 'ব্রহ্মসভা' আদিব্রাহ্মসমাজ নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

ইহাই আদি ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য। এই তথ্য যদি কেবল ইহার একার হইত, তবে সাধারণ্যে উহার প্রকাশ না করিলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু রামমোহনের এই আদি প্রতিষ্ঠান আদি ব্রাহ্মসমাজ কেবল বাঙ্গালার নহে, কিন্তু ভারতেরও নব যুগের ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট। তাই এই আদি ব্রাহ্মসমাজ সেই আদিকাল হইতে যে সব মনীষী ও মহামনা পরিচালকের পরিচালনায় ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে, আমরা তাঁহাদের শকানুযায়ী ধারাবাহিক নামতালিকা সংগ্রহ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি কিনা জানি না। আশা করি মনস্বী ব্যক্তিবর্গ বিশেষতঃ বাঙ্গালার নবযুগের ইতিহাসের যাঁহারা উপাসক, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের এই প্রাথমিক চেষ্টাকে সম্পূর্ণতা দান করিতে সাহায্য করিবেন।

সর্ব্বশেষে 'আদিব্রাহ্মসমাজের পরিচালকবর্গ' বলিতে কি বুঝায়, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা দরকার। ইহার 'সভ্য'সংখ্যা সময় সময় ৬৫০ সাড়ে ছয় শতেরও উপর উঠিয়াছে। এই সভ্যশ্রেণী হইতে একজন সভাপতি, দ্বাদশ জন অধ্যক্ষ, দুইজন সম্পাদক, তিন জন গ্রন্থাধ্যক্ষ ও একজন গ্রন্থ-(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা) সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইতেন।

এক গ্রন্থসম্পাদকের পদ কচিৎ কখন বৈতনিক হইয়াছে। তদ্ব্যতীত বাকী কয়টি উচ্চ পদ চিরদিনই 'অবৈতনিক' হইয়া আসিতেছে। ইহা ব্যতীত আচার্য্য ও উপাচার্য্যগণও এই পরিচালকবর্গ মধ্যে স্থান পাইবেন। এবারে আমরা কেবল 'সভাপতি' 'সম্পাদক' ও 'গ্রন্থসম্পাদকের' নাম-তালিকা প্রকাশ করিলাম।

তত্ত্ববোধিনীসভার সম্পাদকবর্গ।

১৭৬৫—১৭৬৭ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১৭৬৮—১৭৭৪ শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১৭৭৫—১৭৭৬ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও
শ্রীবাগেশ্বর বিদ্যালঙ্কার।
১৭৭৭ শ্রীরমাপ্রসাদ রায় ও
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
১৭৭৮—১৭৭৯ শ্রীবাগেশ্বর বিদ্যালঙ্কার।
১৭৮০ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকবর্গ।

১৭৮১—১৭৮২ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।
১৭৮৩ শ্রীকেশবচন্দ্র সেন ও
শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

১৭৮৪ শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

১৭৮৫ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেন ও

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

১৭৮৬ শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

১৭৮৭ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকবর্গ।

১৭৮৮ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীসারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও

শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

১৭৮৯—১৭৯০ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

১৭৯১—১৭৯২ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

১৭৯৩ শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও

শ্রীনবগোপাল মিত্র।

১৭৯৫—১৮০৮ শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮০৯ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮১০—১৮১২ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও

শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

১৮১৩—১৮২০ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮২১—১৮২৪ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮২৪—১৮২৫ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও

শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী।

১৮২৬ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

১৮২৭—১৮৩১ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

১৮৩২—১৮৩৩ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮৩৪ শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

১৮৩৫—১৮৩৬ শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

১৮৩৭—১৮৪৭ শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮৪৮ শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও

শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তত্ত্ববোধিনী-সভার সভাপতিবর্গ।

১৭৭৩—১৭৭৫ শ্রীযুক্ত রাজা সত্যচরণ

ঘোষাল বাহাদুর।

১৭৭৬—১৭৮০ শ্রীকাশীপ্রসাদ ঘোষ।

১৭৮০—১৭৮৩ শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ও পরে আদিব্রাহ্ম-সমাজের সভাপতিবর্গ।

১৭৮৪—১৮১১ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮১২—১৮২২ শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

১৮৩৮—১৮৪৪ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী।

১৮৪৫ শ্রীআশুতোষ চৌধুরী।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকবর্গ।

১৭৬৫—১৭৭৭ শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

১৭৭৮ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১৮৭৯—১৮৮০ শ্রীনবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৭৮১—১৭৮২ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৭৮৩ শ্রীতারকনাথ দত্ত।

১৭৮৪ শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

১৭৮৫ শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

১৭৮৬—১৭৮৮ শ্রীঅযোধ্যানাথ পাকড়াশী।

১৭৮৯—১৭৯০ শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

১৭৯১ শ্রীঅযোধ্যানাথ পাকড়াশী।

১৭৯২ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৭৯৩ শ্রীঅযোধ্যানাথ পাকড়াশী ও

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

১৬৯৪—১৭৯৯ শ্রীঅযোধ্যানাথ পাকড়াশী।

১৮০০—১৮০৫ শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

১৮০৬—১৮২৩ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮২৪ শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

১৮২৫—১৮২৭ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও

শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

১৮২৮ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮২৯—১৮৩০ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

১৮৩১—১৮৩২ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

১৮৩৩—১৮৩৬ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮৩৭—১৮৪৩ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮৪৪—১৮৪৭ শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮৪৮ শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ও

শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গ্রন্থ-পরিচয়।

জীবন (কাব্য)।—শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন বি-এ প্রণীত। ২০বি দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, আত্মিক পাবলিশিং হাউস হইতে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এস-সি কর্তৃক প্রকাশিত। ৩২ পেজী ডবল ক্রাউন আকারে ১০০+১১/০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১৲ টাকা।

ইহা একখানি আধ্যাত্মিক কাব্যগ্রন্থ। দার্শনিকপ্রবর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, বি এল মহাশয় ইহার একটী নাতিদীর্ঘ সুন্দর ভূমিকা লিখিয়া সাধারণ পাঠকগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। মানবজীবনের প্রভাত, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যার বিচিত্র আলো-ছায়ায় ইহার যে স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ঘটে, কবি তাহাই আপনার সুনিপুণ ভাব, ভাষা ও ছন্দে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে ভাব ও ভাষা বড়ই সুন্দর লাগিয়াছে।

বইখানির ছাপা ও কাগজ আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল। বাধাই মন্দ নয়। এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ খানির ১৲ টাকা মূল্য নির্দ্ধারণ সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

The Sanskrit College Magazine—January. 1927—সংস্কৃত কলেজ হইতে প্রকাশিত এই পত্রের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে ইংরাজী সংস্কৃত ও বাংলা তিন ভাষাতেই রচিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছে। প্রবন্ধগুলি সুনির্ব্বাচিত এবং কৌতূহলোদ্দীপক। কাগজ ও ছাপা উত্তম। আমরা মাত্র একটী বিষয়ে সম্পাদক মহাশয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বঙ্গদেশীয় সংস্কৃত কলেজের মুখপত্র বলিয়া ইহাতে সংস্কৃতের আসন সর্ব্বপ্রথমে, তাহার পর বাংলার ও সবশেষে ইংরাজীর আসন হইলেই শোভন হইত। অধিকন্তু সংস্কৃত ও বাংলায় আরও অধিক সংখ্যক প্রবন্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমান সংখ্যায় দেখিলাম ইংরাজীই প্রধান আসন গ্রহণ করিয়াছে। ইংরাজী প্রবন্ধাবলী ৪০ পৃষ্ঠা অধিকার করিয়াছে, সংস্কৃত প্রবন্ধাদি ১৬ পৃষ্ঠা ও বাংলা ২০ পৃষ্ঠা অধিকার করিয়াছে। আমরা ইহার বিপরীত হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করি। আমরা এই পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি আশা করি।

শোক-সংবাদ।

৺প্রমিলাসুন্দরী দেবী।—বিগত ২৯শে ফাল্গুন রবিবার কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত লালমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী ৺প্রমিলাসুন্দরী দেবী সাতটী পুত্র-কন্যাকে মাতৃহীন করিয়া অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। ভগবান ইঁহার শোকার্ত্ত স্বামী ও সন্তান-সন্ততির অন্তরে সান্ত্বনা বিধানপূর্ব্বক লোকান্তরিত আত্মার সদ্গতি করুন।

৺কিরণচন্দ্র মল্লিক।—আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার জনৈক সভ্য ও ইহার হিতৈষী বন্ধু শ্রীপাঁচুগোপাল মল্লিক মহাশয়ের সুযোগ্য ভ্রাতা কিরণচন্দ্র মল্লিক গত ১৩ই চৈত্র রবিবার অকালে পরলোকগত হইয়াছেন। শ্রীমান কিরণচন্দ্রের সহিত ব্রাহ্মসমাজের ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটিয়াছিল। তিনি চিন্তামণিবাবুর উৎসাহে স্বরলিপির সাহায্যে স্বয়ং ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি আয়ত্ত করিয়া 'ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ' 'বেহালা ব্রাহ্মসমাজ' ও 'সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজের' সঙ্গীতের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতেন। তাঁহার স্বাভাবিক সুমিষ্ট কণ্ঠ সকলকে মুগ্ধ করিত। সম্প্রতি প্রায় এক বৎসর হইল, তিনি কার্য্যোপলক্ষ্যে মীরাটে অবস্থান করিতেছিলেন। সেখানে অকস্মাৎ কণ্ঠনালী রোগে আক্রান্ত হওয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা একজন সঙ্গীতজ্ঞ তরুণ বন্ধুকে হারাইলাম। আমরা তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারকে আমাদের প্রগাঢ় সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণবিধানপূর্ব্বক তাঁহার বিয়োগব্যথিত ভ্রাতা পত্নী ও সন্তানসন্ততির অশান্ত হৃদয়ে শান্তিদান করুন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

সংবাদ।

প্রার্থনা সমাজে হীরকোৎসব।—গত ১৫ই চৈত্র বোম্বাই-নগরীস্থ 'প্রার্থনাসমাজ' ষষ্টিতম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের সহিত ইহার সাধ্য ও সাধনা অভিন্ন। বর্ষপ্রবেশ উপলক্ষ্যে তথায় একপক্ষকালব্যাপী একটী হীরকোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। ভগবদনুগ্রহে উৎসব পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছিল।

দানপ্রাপ্তি।—আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য উদারদর্শী শ্রীযুক্ত লালমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তদীয় পত্নী ৺প্রমিলাসুন্দরী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে আদি-ব্রাহ্মসমাজে এককালীন ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

কলিকাতা সংস্কৃত সমিতির সমাবর্ত্তন সংস্কার।—কয়েক বৎসর পরে গত ৮ই চৈত্র মঙ্গলবার কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট গৃহে, বঙ্গেশ্বর লর্ড লিটন বাহাদুরের সভাপতিত্বে, কলিকাতা সংস্কৃত সমিতির সমাবর্ত্তন উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ আচার্য্য শ্রীআদিত্যনাথ

মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই মৃত উৎসবটীকে পুনঃ সঞ্জীবিত করিয়া সকলের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। আদিত্য নাথের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সংস্কৃত কলেজের নবতর অভ্যুদয় সূচিত হইতেছে। সংস্কৃত কলেজের পুনরভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার অতীত গৌরব ফিরিয়া আসুক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

—

বর্ষশেষে সান্ধ্যোপাসনা।

আগামী ৩০শে চৈত্র বুধবার বর্ষশেষ। প্রত্যেক জীবনের একটী বৎসর নিঃশেষিত হইবে। জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়া যিনি আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন, এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজ-গৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে। সর্ব্বসাধারণের সবান্ধবে যোগদান প্রার্থনীয়।

নববর্ষে সান্ধ্যোপাসনা।

নববর্ষ উপলক্ষ্যে আগামী ১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হইবে। সর্ব্বসাধারণের সবান্ধবে যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

—

নববর্ষে প্রাতরুপাসনা।

আগামী ১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার নববর্ষ। এদিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। তদুপলক্ষ্যে প্রাতে ৭ঘটিকার সময় মহর্ষিদেবের যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে।
